ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬১ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ।। ২৭ বৈশাখ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১১ মে, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক দখল নিয়ে সিপিএম-তৃণমূল জোর টক্কর

গূঢ়পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে ভোটপর্ব এখন শেষ পর্যায়ে। এরপর ১৬ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ফলাফলের জন্য। কিন্তু এবার এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামপন্থীরা এবং তাদের বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু তোষণে একে অন্যকে টেক্কা দিয়েছে। উত্তর কলকাতা সংসদীয় কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সমর্থিত সি পি এম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম হনুমান মন্দিরে চরণামৃত পান করে রাজাবাজারে গরম গরম ভাষণ দিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁর দল রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সবার আগে সংখ্যালঘু সমাজের উন্নয়ণে কাজ করবে। বোঝাই যায় যে, রাজ্যের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের দখল নিয়ে সি পি এম-তৃণমূলের এই জোর টক্কর চলেছে। এবং চলবে। কারণ, আগামী বছর কলকাতা পুরসভার নির্বাচন ও তারপর ২০১১ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। সুতরাং এই সংখ্যালঘু তোষণ চলবেই। ভোট বড় বালাই।

নির্বাচনে ভোট পেতে বা জিততে সংখ্যালঘু তোষণের বিষময় ফল রাজ্য জুড়ে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে। যেমন, হুগলী

জেলার মশাটে গত ২২ এপ্রিল সেখানকার বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র এবং এস এফ আইয়ের কট্টর সমর্থক সিরাজুল রহমানকে কলেজের ছাত্ররা মারধর করে। অভিযোগ, সিরাজুল গত ১৬ এপ্রিল কলেজে বিদ্যার্থী পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে ভারতমাতার ছবিতে পদাঘাত করে। হিন্দু বিরোধী শ্লোগান দেয়। ঘটনাটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এস এফ আইয়ের দাপটে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এরপর গত ২২ এপ্রিল সিরাজুল কলেজে এলে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাকে তার

(এরপর ৪ পাতায়)

খোদ মাওবাদী নেতার স্বীকারোক্তি

গড়বেতা-কেশপুর পুনর্দখল করতে তাদের ডেকে আনে সিপিএমই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মাওবাদীরা এখন পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় শাসক দলের নেতা-কর্মীদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই এই তথাকথিত মাওবাদীদের হাতে শাসক দলের বিশেষত সি পি এমের অনেক নেতা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। আরও অনেকে তাদের খতম তালিকায় রয়েছেন। কিন্তু কথা উঠছে, এই মাওবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে বাংলায় জায়গা করে দিল কে? কীভাবেই বা তারা বামফ্রন্টের লালদুর্গে পায়ের তলায় শক্ত জমি খুঁজে পেল! এখন এরাজ্যের শাসক দলের নেতারা একবাক্যে মাওবাদী, তৃণমূল ও বিজেপিকে এবং ইদানীং কংগ্রেসকে একাসনে বসিয়ে তুলোধুনা করছেন। সম্প্রতি কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক এক তদন্তসাপেক্ষ প্রতিবেদনে ফাঁস করে দিয়েছে যে, সি পি এম-ই একদা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া গড়বেতা ও কেশপুরের লালদুর্গ বিজেপি-তৃণমূল জোটের কাছ থেকে পুনর্দখল করতে মাওবাদীদের ডেকে এনেছিল। মাওবাদী ক্যাডারদের হাতে তুলে দিয়েছিল গুলি-কার্তুজ-বন্দুক। সেইসব গুলিতে কত তৃণমূল-বিজেপি কর্মীর জীবন শেষ হয়ে গেছে সেকথা কখনও সি পি এম নেতারা ভুলেও উচ্চারণ করেন না।

একান্ন বছর বয়সী কিষাণজী ওরফে কোটেশ্বর রাও একান্ত সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি জানিয়েছেন, সি পি এমই তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাঁরই হাতে পার্টি অফিসেই ৫০০০ কার্তুজ তুলে দিয়েছিল। কোটেশ্বর পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, তারা সেদিন সি পি এমের পাশে না থাকলে সি পি এম নেতা ও মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ বেঁচে থাকতেন না। তবে এসবই দীর্ঘ ন'বছর আগেকার কথা। ন'বছরে

জঙ্গলের নিরাপদ স্থানে কোটেশ্বর রাও।

পাশার দান উল্টে গেছে। তারা সি পি এম থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কোটেশ্বর জানান— পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে সি পি এমের নিরীহ সাধারণ গরীব মানুষের ওপর দমন-পীড়ন, বীরভূমের নানুর, সুচপুর এবং গড়বেতার ছোটো আঙারিয়ার গণহত্যা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা গরীব মানুষদের মধ্যে কাজ শুরু করি। পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে মুখর হই। তারপর গরীবদের দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে জনতাকে একত্রিত করি। ২০০০ পর্যন্ত কোনও সি পি এম কর্মীর গায়ে আমরা হাত দিইনি।

কিষাণজীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, তাহলে আপনারা সি পি এম নেতাদের মারছেন কেন? তার উত্তরে তিনি বেশ আক্রমণাত্মক সুরে বললেন, 'প্রচারমাধ্যম সবসময়ই সি পি এমের নেতা-কর্মী খুন হলেই ঢালাও করে প্রচার করে। যেন মানুষ মারাটাই আমাদের কাজ। কেউ কীভাবে এই ঘটনাকে অস্বীকার করবে যে, নন্দীগ্রামে সি পি এমের ক্যাডাররা গ্রামের মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। আর তা করেছিল সি পি এম ব্রিগেড নন্দীগ্রাম দখল করার পর। এটা কী গণতন্ত্রের নমুনা? বিশ্বাস করুন, আমরা চরম ব্যবস্থা নেবার আগে অনেকবারই আমাদের লোকেদের নিয়ন্ত্রিত করেছি। মানুষের মনোভাবনা নিরীক্ষণ করতে বলেছি।'

কোটেশ্বর আরও জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের হাতিয়ার যোগান দিয়েছিল। নন্দীগ্রামের লড়াইয়ে তারা ১৪ মার্চ, ২০০৭-এ ছিলেন। যোগান বন্ধ হতে তারা পিছু হটেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র রিপোর্ট

কালোটাকার ইস্যুতে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আমেরিকা ভিত্তিক সংস্থা— 'গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র প্রতিবেদনে বিদেশে কালো টাকা গচ্ছিত থাকার ইস্যু আবার এক নতুন মোড় নিল। এই সময়ে ভারতে লোকসভার নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। এই নির্বাচনে এন ডি এ-র তরফে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী এই কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় এলে বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ২৫ লক্ষ কোটি ভারতের কালো টাকা দেশে ফেরৎ আনবেন। বলা বাহুল্য, ওই আমেরিকান সংস্থাটির (জি এফ আই) প্রতিবেদন আদবানীজীর বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করল। প্রতিবেদনটির শীর্ষক হল 'উন্নত দেশ থেকে অবৈধ আর্থিক স্রোত - ২০০২-০৬' পর্যন্ত। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর ভারত থেকে গড়ে ২২.৭ বিলিয়ন থেকে ২৭.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের কালো টাকা বিদেশে গচ্ছিত রাখা হচ্ছে। বর্ষীয়ান জননেতা আদবানীজী এবং স্বনামধন্য

দেশ	গচ্ছিত টাকা (বিলিয়ন ডলার)
চীন-	২৩৩-২৮৯
সৌদি আরব-	৫৪-৫৫
মেক্সিকো-	৪১-৪৬
রাশিয়া-	৩২-৩৮
ভারত-	২৩-২৭

যোগগুরু রামদেবজী এই কালো টাকার কথা জোর দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরার পর থেকে কংগ্রেস শিবিরের সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা লড়াই

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

ইউ পি এ আমলে ভারতে সর্বাধিক সন্ত্রাসবাদী হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদ আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত প্রথম সারিতে রয়েছে। বিশেষত, ২০০৮ সালে। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৮-এ একথা বলা হয়েছে। ওই রিপোর্টে এই দুরবস্থার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করা হয়েছে ভারতবর্ষের সেকেলে পুরাতন অক্ষম আইন, আইন বলবৎকারী সংস্থার অত্যধিক দায়-দায়িত্বের বোঝাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, এন ডি এ আমলে সন্ত্রাস দমনে 'পোটা' আইন চালু করা হলেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সমর্থিত ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় বসেই পোটা আইনকে তুলে দেয়। এমনকী কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাস দমনে যে আইন 'মকোকা' রয়েছে, সেই একই আইন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি চালু করতে চাইলেও কেন্দ্রের সম্মতি না মেলায় তা চালু করা যায়নি।

গত বছরের ২৬ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হানা বাদেও আরও সাতটি বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে সারা দেশজুড়ে। ওই প্রতিবেদনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ওইসব সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনার চক্রান্তকারী অথবা সন্ত্রাসবাদীদের কাউকে বিচারের জন্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। সন্ত্রাসবাদী ও দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা ভারত প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়ে চলেছে। এর ফলে বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। শুধুমাত্র মুম্বাইয়েই ২৬/১১ আক্রমণে ৬ জন আমেরিকান সহ ১৮৩ জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হন।

ওই প্রতিবেদনে জোরালোভাবে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ভারত সরকার এই সন্ত্রাসকে দমন করার চেষ্টা করলেও তা সফল হচ্ছে না। কারণ, মরচেপড়া সেকেলে আইন এবং আইনরক্ষাকারী সংস্থার উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপের বোঝা। তবে মুম্বাই আক্রমণের পরবর্তী সময়ে সংসদে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য আইন পুনর্গঠন এবং জাতীয় স্তরে একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে সন্ত্রাস দমনে পারস্পরিক সহযোগিতাও বৃদ্ধি হয়েছে।

এককথায় বলা যেতে পারে, সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়াতেই সন্ত্রাসবাদ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকায় সহযোগিদের নিয়ে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদকে দমন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্বল সরকারের কারণে সন্ত্রাসবাদের

(এরপর ৪ পাতায়)

বিজেপির অভিযোগ

চিনির দাম বাড়িয়ে ইউ পি এ সরকার ৪০০ কোটি টাকা নির্বাচনী তহবিলে ঢুকিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইউ পি এ সরকার শুধুমাত্র চিনির দাম বাড়িয়েই বাজার থেকে কমপক্ষে ৪০০ কোটি টাকা তুলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর সেই টাকা নির্বাচনী তহবিলে জমা পড়েছে। কুড়ি লক্ষ টন চিনিতে কিলো প্রতি দু'টাকা নির্বাচনী তহবিলে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। অপরপক্ষে সরকার চিনি সংরক্ষিত রাখার পরিমাণ ৫০০ কুইন্টাল থেকে অনেক বাড়িয়েছে। তার ফলেই খোলাবাজারে চিনির দাম ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে।

এই অভিযোগ জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় মুখপাত্র প্রকাশ জাবড়েকর। তিনি আরও বলেছেন, বিজেপির প্রতিশ্রুতি হল ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যেই দাম কমানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এন ডি এ আমলে চিনির দাম ছিল কিলোপ্রতি ১৪ থেকে ১৬ টাকার মধ্যে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে নির্বাচকদের সামনে এন ডি এ এবং ইউ পি এ আমলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি নির্বাচনী প্রচার সিডি বিজ্ঞাপনের আকারে বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিল। সেইমতো নির্বাচন

প্রকাশ জাবড়েকর

কমিশনের ছাড়পত্রও পাওয়া গিয়েছিল। এন ডি এ আমলে চিনির দাম ছিল ১৬ টাকা আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৮ টাকা। শেষপর্যন্ত ভিডিও সিডি-টি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত হওয়ার আগেই বিজেপি তা প্রত্যাহার করে নেয়।

প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন বি জে পি-র অপর মুখপাত্র সিদ্ধিনাথ সিংহ। তিনিই দলের নির্বাচনী প্রচার সামগ্রী তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। শ্রীসিংহ জানিয়েছেন, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র পাওয়ার পর চিনির দাম একলাফে কেজিপ্রতি ৬ টাকা বেড়েছে। সেজন্য তাঁরা দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, এন ডি এ এবং ইউ পি এ আমলে দ্রব্যমূল্য পাশাপাশি দেখিয়ে বড় বড় হোর্ডিং রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাগাতে।

প্রকাশ জাবড়েকর অভিযোগ করেছেন, সরকার কিছু আমদানিকারীকে অশোধিত চিনি কম দামে আমদানি করতে ছাড়পত্র দেয়। তারা ইতিমধ্যে কুড়ি লক্ষ টন চিনি ১৬ টাকা করে আমদানি করে, যা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২৭ টাকা কেজি দরে। তিন বছরের মধ্যে ওই চিনিই আবার রপ্তানি করতেও সরকার অনুমতি দিয়েছে। বলা বাহুল্য, দেবেগৌড়া-গুজরাল আমলে গম কেলেঙ্কারি (আমদানি)-র চেয়ে মনমোহন আমলের চিনি কেলেঙ্কারি কোনও অংশেই কম নয়।

এই সময়

পুনর্গঠন

এক দেড় মাস আগে বিডিআর বিদ্রোহে ঝড় বয়ে গেছে বাংলাদেশে। চরম সংকটের মুখে পড়েছিল সে দেশের শাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশ রাইফেলস্‌কে আবার নবজীবন দেওয়ার ইঙ্গিত দিল ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বি এস এফ)। বিডিআর-কে তারা আবার নতুনভাবে গড়ে তুলতে চায়। এর জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ বিডিআর-কে নতুন নামে শুদ্ধি করণ করার পক্ষপাতী। রাইফেলসের উর্দি থেকে রক্তের দাগ মেটাতেই, নামের শুদ্ধি করণের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন বিএসএফ-এর মহানির্দেশক এম এল কুমাওয়াত।

ভোট স্বার্থ

এতদিন মুখে রা ছিল না। আফজল গুরুর ফাঁসির বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করেনি কংগ্রেস। বিজেপি বিষয়টি জনসমক্ষে আনলেও, কংগ্রেসের অবস্থান ছিল নেতিবাচক। এমনকী তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল আফজলের ফাঁসির সঙ্গে সর্বজিতের ফাঁসির তুলনা করেন। তাঁর ওই মন্তব্যের সমালোচনা করেন অনেকেই। তবুও কংগ্রেস হাইকমান্ড ছিল নীরব। অবশেষে ভোটের মাঠে ভোট কাঁপাতে কৌশলে চাল চাললেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিং। আফজলের ফাঁসি দিতে তাদের আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। এইসঙ্গে তিনি এতদিনের টালবাহানার অভিযোগও অস্বীকার করেন। তবে বিরোধীদের মতে, মুসলিম ভোটের স্বার্থে সংসদ হামলার কাণ্ডারি আফজলকে কংগ্রেস কোনও মতেই ফাঁসি দেবে না।

বৃহত্তম নির্বাচন

তারাও দেখলেন বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন। মরিশাসের এক প্রতিনিধিদল চাক্ষুষ করলেন এদেশের লোকসভার দ্বিতীয় দফার ভোট। খুঁটিয়ে দেখলেন ভোট, ভোটার ও ভোটকেন্দ্র। মরিশাসের ইলেকট্রল সুপার ভাইসারী কমিশনের চেয়ারম্যান ইউসুফ আবোবাকেরের নেতৃত্বে ওই দল ভারতে আসেন। ভোটের পদ্ধতি দেখে তারা রীতিমতো বিস্মিত। ভারতের ভোট ব্যবস্থাকে তারা 'মাদার অব অল ইলেকশন' বলে চিহ্নিত করেন।

আবার সিঙ্গুর

ছোটো গাড়ির আশা পিছু ছাড়ছে না সিপিএমের। ন্যানো-র আশা পূর্ণ না হলেও, সে আশা পূর্ণ করতে সম্ভবত আসছে এক চীনা সংস্থা। 'কাস্ট অটোমেটিভ ওয়ার্ক' নামে এক ছোটো গাড়ি নির্মাণ সংস্থা সিঙ্গুরের মাটিতে আসতে চলেছে। সিপিএম সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী সংস্থার গাড়ির মূল্য হবে এক লাখ ৬০ হাজার টাকা। ইতিমধ্যেই সংস্থাটি মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছে।

গুরুত্ব বাড়ছে

আজও এই পৃথিবীতে মা-বাবা-র ভূমিকার তুলনা হয় না। অতুলনীয়। কিশোর বয়সীদের মাদক প্রবণতা কমাতে, পিতা-মাতা-র ভূমিকার কথা উঠে এল বেশি করে। জার্নাল অব স্টাডিজ অন অ্যালকোহল অ্যান্ড ড্রাগস-এর 'মে' মাসের ইস্যুতে এক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কিশোর বয়সীদের মধ্যে মদের নেশা কাটাতে মা-বাবা'র সঙ্গে সন্তানদের ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্কের প্রয়োজন। খোলামেলাভাবে এ বিষয়ে সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা চালালে লাভ হয় বলেও জার্নালে মত প্রকাশ করা হয়েছে। জার্নালটি এবিষয়ে পিতা-মাতাকেই এই গুরুদায়িত্ব সামাল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

ঘন বিপদ

পাকিস্তানে জঙ্গি বাড়বাড়ন্ত খোদ পাকিস্তানের ক্ষেত্রেই অশনি সংকেত। এমনকী, এর ফলে ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে রাষ্ট্রটি। এমনই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন মার্কিন সেনা কমাণ্ডার ডেভিড পেত্রাউসের উপদেষ্টা ডেভিড কিলকুলেন। আটলান্টিক কাউন্সিলের এক রিপোর্টেও এমন আভাস দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান যদি আস্তে-আস্তে জঙ্গি কবলিত হয়ে পড়ে, তাহলে খুব শীঘ্রই বিপদ ঘনিয়ে আসবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

সোয়াইন ফ্লু

সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের প্রকোপ নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও চিন্তিত। ভারতীয় ডাক্তাররাও শূয়োর থেকে সংক্রমিত সোয়াইন ফ্লু-র সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে ডাক্তারদের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে এর প্রয়োজনীয় মোকাবিলার নীল নকসাও তৈরি হয়েছে। এই সঙ্গে আমেরিকা, মেক্সিকোতে ভ্রমণের বিষয়েও যথেষ্ট সতর্ক করেছেন তারা।

পরিবর্তন চাই

বামফ্রন্টের ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীমহল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার পর থেকেই বুদ্ধিজীবীমহল ফ্রন্ট বিরোধী। ভোটের আগে থেকেই তাঁদের অনেকেই ফ্রন্ট বিরোধী শিবিরে সামিল। লোকসভা ভোটে ফ্রন্টকে আরও সবক শেখাতে উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই পরিবর্তন চাই বলে প্রকাশ্যে হোর্ডিং লাগিয়েছেন। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ পুস্তিকা ও সিডি প্রকাশ করলেন। কেন এরাজ্যে পরিবর্তন প্রয়োজন থেকে শুরু করে, বামপন্থীদের মুখোশ খুলতেই তারা এগুলি প্রকাশ করেন। চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্নর নেতৃত্বে বই ও সিডি প্রকাশিত হয়।

মন্দা যুক্ত

বিশ্বজুড়ে সমস্ত শিল্পেই আর্থিক মন্দার ছোঁয়া লাগলেও, ভারতের মিডিয়া শিল্প কিন্তু তার ব্যতিক্রম। মিডিয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচন ঘিরে আটশো কোটিরও বেশি টাকা এই শিল্পে আবর্তিত হয়েছে। এই জোয়ার ভারতের সর্বত্র প্রবাহিত হওয়ায় অন্তত একটা শিল্প মন্দার হাত থেকে রক্ষা পেল বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আবার ঝুলন্ত সংসদ?

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচন প্রায় শেষ হইবার মুখে। আর মাত্র একটি পর্বই বাকি রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে এই লোকসভাও কি হাং পার্লামেন্ট বা ঝুলন্ত সংসদ হইয়া থাকিবে? এই প্রশ্নটাই সম্প্রতি লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। তাহার কারণ হইল, সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটগুলি ঝুলন্ত সংসদকেই উপহার দিয়াছে। ইহার পশ্চাতে অবশ্য অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। ভারতের মতদাতাগণ প্রথাগত শিক্ষায় 'অশিক্ষিত' বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতারা সাধারণ মানুষের হাতে তথা প্রাপ্ত বয়স্কদের হাতে সরকার গঠনের অধিকার দিয়া যে ভুল করেন নাই, তাহা ১৯৫২ সাল হইতে শুরু করিয়া এ যাবৎ ১৪টি লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। আজকের দিনে প্রগতিশীল রাজনীতিকগণ সাধারণ মানুষকে যতোই 'অশিক্ষিত' বলুন না কেন, কিংবা প্রগতিশীলতার ধারক-বাহকগণ যতোই এই কথা বলুন না কেন, শিক্ষা ব্যতীত গণতন্ত্র অসফল ও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কিন্তু পাশাপাশি এই কথাও সমান সত্য যে, শিক্ষা মানে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। সেই শিক্ষা এই দেশের সাধারণ মানুষের যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। যে দেশের সাধারণ মানুষ কঠিন কঠিন লোকগীতির তথা দেহতত্ত্বের জটিল কথাগুলির অর্থ অনায়াসেই বুঝিতে পারে, তাহাদেরকে যাহারা অশিক্ষিত বলিয়া ভাবে, আসলে তাহারা নিজেরাই অশিক্ষিত ও মূর্খ। দ্বিতীয়ত, জাতীয় দলগুলি নিজেদের নীতি ও আদর্শ ঠিকঠাক মতো অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, জাতীয় দলগুলিই অধিক জনগ্রাহ্য সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণে সাম্য প্রদর্শন করিতে না পারিয়া বৈষম্যের জন্ম দিয়াছে। চতুর্থত, সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণে জাতীয় দলগুলির ব্যর্থতাই নতুন নতুন আঞ্চ লিক দলগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত দলগুলির সংখ্যাধিক্যই এই দেশে দ্বিদলীয় প্রথার বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গণতন্ত্রের পীঠস্থানগুলিতে দুইটিই জাতীয় দল থাকে। ছোট ছোট একাধিক দল যে থাকে না তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের প্রভাব-পতিপত্তি তেমন থাকে না, প্রধান দুইটি দলেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি থাকে। এই দেশে ছোট দলগুলির সংখ্যাধিক্য বেশি থাকায়, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা এখনও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার জন্য অবশ্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। দেশবাসী আশা করিতে পারে, আগামী দিনে দলগুলিই বুঝিতে পারিবে যে প্রায় অভিন্ন নীতি ও আদর্শের একাধিক দল না হইয়া একটি দল থাকিলেই তাহা অনেক বেশি শক্তিশালী হইয়া উঠে। আবার দলগুলি নিজেদের নাম ও অস্তিত্ব বিলোপ না করিয়া জোট গঠন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। তাহা হইলেও দেশে এতগুলি দলের সৃষ্টি হয় না। উল্লেখ্য, এই দেশে স্বীকৃত ছোট-বড় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় হাজার।

নিজেদের অস্তিত্বকে আরও বেশি করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্যই বামদলগুলি এবার বামফ্রন্টকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে অ-কংগ্রেস ও অ-বিজেপি দলগুলিকে লইয়া তৃতীয় ফ্রন্ট গড়িতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সিপিএমের বামফ্রন্টের যেখানে বিশ্বাসযোগ্যতা নাই, সেখানে বৃহত্তর ফ্রন্টে সিপিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকিবে--ইহা দুরাশা মাত্র। সিপিএমের 'দাদাগিরি' কিংবা 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'-গিরির জন্যই ইহা সম্ভব নয়। ১৯৭৭সালে অবশ্য এই বিষয়ে পথ দেখাইয়াছিল 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ।' ওই দিনটি নিজের দলের বিলুপ্তি ঘটাইয়াই লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের গঠিত জনতা পার্টিতেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জনতা পার্টি 'ম্যাসিভ ভিক্টরি' বা বিপুল জয় পাইলেও ছোট ছোট দলগুলি একত্র থাকার শিক্ষা পায় নাই বলিয়া সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা জনতার এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে তাহা হইত আদর্শ।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও রাজনৈতিক কলমচিগণ সকলেই ভবিষ্যতবাণী করিতেছেন যে ২০০৯ সাল আরও একটি ঝুলন্ত সংসদ দেশবাসীকে উপহার দিতে চলিতেছে। তৃতীয় দফার নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ায় ৩৭২টি আসনের ভাগ্য নির্ধারণ হইয়া গিয়াছে। সেদিক হইতে বলা যায় তৃতীয় দফার ভোটটি হইবে একটি 'ক্রুসিয়েল' বা নির্ণায়ক ভোট। বাকি দুইটি পর্বে (৭ ও ১৩ মে) ভোট হইবে ১৪৩টি লোকসভা আসনে। বিজেপি বা কংগ্রেস কোনও দলের পক্ষেই ২০০-র বেশি আসন পাওয়া দুরূহ। যাহার অর্থ, উভয় দলকেই সরকার গড়িবার জন্য সেই 'ম্যাজিক ফিগার' বা যাদু সংখ্যা ২৭২ ছুঁইতে আরও অন্তত ৭২ হইতে ৭৫ জন সংসদের সমর্থন পাইতে হইবে---যাহা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার। আর এইজন্য নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক দলগুলির নয়া সমীকরণ করিতে হইবে।

গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনুন

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

নির্বাচন চলছে বলেই অনেক কথা মনে আসছে।

অবশ্যই নির্বাচনী লোকসভার ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হবে দিল্লীর মসনদে কারা বসবে। কিন্তু এই রাজ্যের রয়েছে ৪২টা আসন। সুতরাং এখানে ফলাফল কি হবে, সেটার কেন্দ্রীয়স্তরেও একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু দরকার সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টকে একটা বড়সড় ধাক্কা দেওয়া। বত্রিশ বছরের একাধিপত্যের ফলে এদের জন্য যে পচন দেখা দিয়েছে, এবার তার বিষক্রিয়া থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্ত করতেই হবে। প্রত্যেকটা সুস্থ নাগরিকের তাই এবার কর্তব্য হল ভোটের মাধ্যমে এই শাসকদের বিদায় দেওয়া।

লক্ষ্য করুন, কয়েকদিন আগে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষ বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যে, নন্দীগ্রামে পুলিশ দুর্গন্ধ মুছবে?

শুভ্রকেশ, স্বচ্ছবেশধারী সংস্কৃতিমনস্ক এই মুখ্যমন্ত্রীর কি 'ম্যাকবেথ' পড়া নেই? আরও লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হল---সেই ঘটনার পরেও, নভেম্বরে পুলিশ পিকেট সরিয়ে হত্যালীলার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে---তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সূর্যোদয়'। আসলে সেটা ছিল জাতীয় মানবিকতার সূর্যাস্ত। ১৪ মার্চের সেই গুলি চালানাকে কলকাতা হাইকোর্ট 'Wholly unconstitutional' বা চূড়ান্ত অসাংবিধানিক ব্যাপার বলে নিন্দা করেছিল। রাজ্যপাল সেটাকে 'cold horror' বা হাড় হিম করা সন্ত্রাস বলেছিলেন। আর নভেম্বরের নারকীয়তা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পৈশাচিকতার অন্ধকারে দেওয়ালীর সব আলো ম্লান হয়ে গেছে।

ব্যস, শুরু হয়েছে বিচারপতি ও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিষোদগার। বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করেছেন, মিছিল করেছেন--তাঁদেরও নিন্দিত করা হয়েছে।

দরকার ৯৯৭ একক, নন্দীগ্রামে ৬৫০০০ একর। এটা কি মগের মুলুক?

এরা না বোঝে শিল্পায়নের অর্থনীতি, না রাখে জনমানসের খবর। এভাবে নাকি চাকরির সুযোগ হয়। ক্যাডেররা জোয়ান রবিনসন, গার্নার মীর্ডাল দূরের কথা, একটু অম্লান দত্ত বা ভবতোষ দত্তের লেখা পড়েছেন? কীভাবে শিল্পায়ন হয়, কি ধরনের শিল্প 'লেবার-ইন্টেনসিভ' বা কর্মদায়ী, কৃষি অনুসারী শিল্প কাকে বলে--এই সব ব্যাপারে এদের এক বিন্দু ধারণা আছে?

আছে সশস্ত্র ক্যাডার, অনুগত পুলিশ বাহিনী আর কিছু বশংবদ আমলা। অবশ্য আরও আছে---আছে লোভ, লালসা, গুছিয়ে নেওয়ার উদগ্র বাসনা ও অন্তহীন নীচতা। আরও আছে মিথ্যাচারের বেসাতি। এরা মার্ক্সের নয় গোয়েবলদের শিষ্য।

রাজভবনে চুক্তি হল, শিল্পমন্ত্রী তাতে সাক্ষী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে বিরোধী নেত্রীকে জানালেন মধুরেণ সমাপয়েৎ

> **"কী বিচিত্র এই রাজনীতি। যাঁরা টাটা-বিড়লাদের গালমন্দ না করে জলস্পর্শ করেনি, তারা এখন তাদের সঙ্গে 'ট্রেড সিক্রেট' নিয়ে মেতে ওঠে। কৃষকের সঙ্গে শিল্পপতির জমি কেনাবেচার কোনও ব্যাপার নেই--পুলিশ আর ক্যাডার দিয়ে জমি দখল নিতেই হবে।"**

সেই তাণ্ডব চালাবে এটা জানলে তিনি সেখানে পুলিশ পাঠাতেন না। অথচ আর এক শরিক দলের নেতা (সি পি আই দলের) মঞ্জুবাবু জানিয়েছেন, এই ধরনের কথা বুদ্ধ বাবু কখনও বলেননি।

ভাবের ঘরে এই চুরিতে আমাদের বাম নেতারা যে অতুলনীয় কীর্তির অধিকারী, সেটা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আমরা ভুলিনি, পূর্বতন স্বরাষ্টসচিব প্রসাদরঞ্জন রায় (তাঁকে পরে বদলী করা হয়েছে) আগেই বলেছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী সব জানতেন। দেবব্রত ব্যানার্জি (প্রাক্তন ভূমিরাজস্ব সচিব) এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের লেখা থেকেও জানা যায় যে, সেই নারকীয় ১৪ মার্চের আগে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে চরম ক্ষমতা ব্যবহার করতে বলেছিলেন ('ব্লো দেম আপ')। সেই নারকীয় বীভৎসার দিনে অন্তত ১৪ জন কৃষক নিহত হয়েছিলেন, ধর্ষিতা হয়েছিলেন রাধারানী সিট প্রমুখ কিছু অসহায় নারী। লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি চলেছে অবাধে, নিষ্ঠুর উল্লাসে। পুলিশের উর্দি পরে সেই নরমেধ যজ্ঞে অংশ নিয়েছিল কিছু নরাধম ক্যাডারও। জনআদালতের বিচারপতি এস. ভার্গব (সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) এই নারকীয় কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

ন্যায়বোধ বা বিবেক বলে মুখ্যমন্ত্রীর কিছু থাকলে, তিনি পদত্যাগ করতেন না? রাজা ডানকানকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতক ম্যাকবেথ (সেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথ') পরে আত্মগ্লানিতে বলেছিল, সমস্ত সমুদ্রের জলে হাত ধুলেও কী তাঁর হাতের রক্তের দাগ যাবে? আরবের সব সুগন্ধি ঢাললেও হত্যার ধিক্কার জানিয়েছে এমন নেতা, কর্মীরা যারা তাঁদের পায়ের নখের যোগ্য নয়। এক অর্বাচীন নেতা বলে ফেলেছেন, তাঁদের ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।

এই ধরণের দম্ভ, ক্রোধ ও মূর্খতা জন্মায় দীর্ঘদিনের রাজ্যশাসনের অমানবিক গর্বে। ধরাকে তখন সরা মনে হয়----মানবিকতাকে তখন গ্রাস করে পশুত্ব।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কাদের হতাহত করতে হল? কাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল স্বগৃহ থেকে? লুণ্ঠিত-সর্বস্বান্ত হলেন কারা? না, শোষক শ্রেণীর বিত্তবান, লুঠেরা চক্রের কেউ না, হতাহত ও ধর্ষিতা হয়েছেন সর্বহারা শ্রেণীর কৃষিজীবীরাই। কিন্তু ঘাতকেরা ছিল কারা? উত্তর একটাই----সর্বহারাদের তথাকথিত নেতা/কর্মীরা। মার্ক্সবাদের কী নিষ্ঠুর, কী করুণ পরিণাম! সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি (মার্ক্সবাদী নাবুদ্রিপাদের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী) কৃষ্ণ আইয়ার তাই জ্যোতিবাবুকে লিখেছেন, যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁদের উচিত ছিল কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো, তারা কিন্তু মোটর শিল্প ও বড়লোকী 'হাব'-এর জন্যে শিল্পপতিদের পক্ষ নিয়েছেন।

কী বিচিত্র এই রাজনীতি। যাঁরা টাটা-বিড়লাদের গালমন্দ না করে জলস্পর্শ করেনি, তারা এখন তাদের সঙ্গে 'ট্রেড সিক্রেট' নিয়ে মেতে ওঠে। কৃষকের সঙ্গে শিল্পপতির জমি কেনাবেচার কোনও ব্যাপার নেই--পুলিশ আর ক্যাডার দিয়ে জমি দখল নিতেই হবে। সেটা আবার 'হিন্দমোটর', 'হুন্ডাই' বা 'মারুতি'র মতো ৩০০/৩৫০ একর হলে চলবে না- সিঙ্গুরে হয়েছে এবার থেকে পরামর্শ করেই তিনি চলবেন।

তাহলে পরের দিনই ডিগবাজী খেতে হল কেন? কোনও সুস্থ সভ্য সরকার এটা করে? ১৯৩৫ সালে বৃটিশ ক্যাবিনেটের সম্মতিতেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যামুয়েল হোর ফ্রান্সে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লাভালের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন। যার বয়ান প্রকাশিত হতেই সারা দেশ ফুঁসে উঠেছিল, উত্তাল হয়ে উঠেছিল পার্লামেন্ট। সরকারের পতন আসন্ন জেনে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্যার হোরকে দায়দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ফলে স্যার হোর পদত্যাগ করে ক্যাবিনেটেকে বাঁচিয়েছেন।

আমাদের বিচিত্র গণতন্ত্রে এ সবের দরকার নেই। রাজ্যপালের সামনে চুক্তি সই করে মন্ত্রীরা ডিগবাজী খেতে পারে? ওটাও মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক কিনা, কে জানে?

গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে হত্যা করা হয়েছে ১৯৬৭ সালেই। বাংলাবন্ধের দিন ৩২ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রায় নিশ্চি হ্ন করা হয়েছিল সাঁইবাড়ির সবাইকে। সেই সব মামলা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে বাম আমলে।

সেই ট্রাডিশন চলছে আজও।

মরিচঝাঁপি, বিজনসেতু, বানতলা, ধানতলা, ছোট আঙরিয়া, সূচপুর, বেঙ্গপূর, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, ইত্যাদির পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে সেই সূত্র ধরেই। শাসক ঘাতক হলে এই রকমই হয়। এবার হবে নয়াচরে দূষণ-সৃষ্টি।

বানতলায় কয়েকজন মহিলা অফিসার

(এরপর ১৪ পাতায়)

পরলোকে মনোরঞ্জন ঘোষ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ।। বাটানগর-বজবজ-মহেশতলা অঞ্চলের বহুজন পরিচিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ঘোষ (ঘোষদা) আর আমাদের মধ্যে নেই। ২৯ এপ্রিল রাত ১-৩০ মিনিটে সঙ্ঘের এই প্রবীন নিরলস কর্মী ৮৬ বছর বয়সে সামান্য রোগভোগের পর দেশমাতৃকার চরণে শেষপ্রণাম জানিয়ে চিরশান্তিধামে প্রস্থান করেছেন। কর্মজীবনে অবসরের ফাঁকে এবং অবসর জীবনে সর্বক্ষণ মিলিয়ে প্রায় ৫০ বছর তিনি এতদঞ্চলে সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবী প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছেন।

সকাল ৬-টা বাজলেই স্বস্তিকা, প্রণব, বিশ্ব হিন্দু বার্তা এবং তৎসহ হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি ও দেশাত্মবোধক পুস্তকাদি নিয়ে সাইকেলে বেরিয়ে পড়তেন। এগারোটার আগে ঘরে ফিরতেন না।

আবার বিকাল ৩-৪-টা বাজতেই রাস্তায় নামতেন, ৭-৮-টার আগে ঘরে ফিরতেন না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বারোমাস তাঁর এই কর্মসূচীর কোনও পরিবর্তন ঘটত না। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি পত্রিকা নিয়ে গ্রাহকদের দরজায় হাজির হতেন। (* স্বস্তিকা'র ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবে ঘোষবাবুকে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল।)

অন্য কোনও পত্র-পত্রিকার জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ জেরক্স কপি করে সেগুলি অনুরাগী গ্রাহক ও পাঠকদের মধ্যে বিলি করতেন। আর পথেঘাটে হিন্দুত্ব অনুরাগী পরিচিত লোকদের সঙ্গে অনর্গল বাক্যালাপ করতেন; যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে তাদের সঙ্গে তর্ক করে তাদের স্বমতে আনতে যত্নবান হতেন বা গ্রাহক করে ছাড়তেন।

এ বিষয়ে ঘোষবাবুর কোনও শৈথিল্য বা বিরক্তি ছিল না।

তিনি গর্ব করে বলতেন যে কোনও মার্কসবাদী ও ইসলামবাদীর সঙ্গে তর্ক করে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন।

ঘোষবাবু নিজে ছিলেন নীতিনিষ্ঠ ও নিয়মনিষ্ঠ। এতদঞ্চলে হিন্দুত্ব বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রচারে তার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার তুলনা ছিল না। হিন্দুসমাজের হিতচিন্তা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ছোট-ছোট বালক-বালিকাদের জাতীয় ভাবধারায় উদ্বেলিত করে তুলতে তিনি নিজস্ব জমিতে সরস্বতী শিশু মন্দির স্থাপন করেছেন।

আমরা আমাদের অগ্রজতুল্য প্রিয় ঘোষদার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমাদের কাছে ঘোষদার শূন্যস্থান কখনওই পূর্ণ হবে না।

বিদ্রোহী বি ডি আর-রা আলফাকে ট্রেনিং দিচ্ছে

সংবাদদাতা।। বাংলাদেশে বিডিআর-এর বিদ্রোহের পর বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী সেনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সূত্র অনুসারে জানা গেছে, বিডিআর-এর এইসব নিরুদ্দেশ বিদ্রোহীরা ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে আলফা ক্যাডারদের ট্রেনিং দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এইরকম ১২০০ জন বিডিআর বিদ্রোহীদের অনুসন্ধানে ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে যারা অস্ত্রশস্ত্রসহ এখনও নিখোঁজ।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এই আঞ্চলিক বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে উল্লেখ করেই সূত্রটি বলেছে, আলফা যে এই নতুন ইনস্ট্রাক্টরদের কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে তার পাকা খবর নেই, আর এই নিখোঁজ বিডিআর-রা তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। সূত্র অনুসারে ২৭-২৮ জন সুশিক্ষিত বিডিআর ভারত-মায়ানমার সীমান্তে আলফা ক্যাডারদের ট্রেনিং দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল এবং নিরন্তর ক্ষমতার লড়াই সেখানে ভারত-বিরোধিতাকে শিথিল করতে পারেনি। জাতীয়তা বিরোধী শক্তিগুলির প্রতি নরম মনোভাবও দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেভাবে ২০০১ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এ লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন। সেসময় এমনসব মৌলবাদী লোককে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছিল, যাদের সঙ্গে ভারত-বিরোধী শক্তি ও জামাতের মতো মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ রয়েছে।

এইসব নিখোঁজ অস্ত্রশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী ও অন্যান্য অপরাধীদের হাতে গিয়ে পড়েছে এবং ভারতের আলফার মতো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির কাছে পাচার করা হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এক বিবৃতিতে বিডিআর-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, একটি রকেট প্রপেলড গ্রেনেড, পাঁচটি ষাট মিলিমিটার-এর মর্টার, রাইফেল ও মেশিনগানসহ ১১৯টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৪৫ হাজার বুলেট পাওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকার নিখোঁজ সেনাদের নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে।

কালো টাকার নতুন মোড়

(১ পাতার পর)

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিষয়টিকে দলীয় রাজনীতিতে তুলে আনছে। আর বামেরা বলছে, এন ডি এ ক্ষমতায় থাকার সময় ব্যবস্থা নেয়নি কেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশাল অঙ্কের কালো টাকার মালিক জয়ললিতাকে এন ডি এ সরকার বাঁচাতে চায়নি বলে জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে দলের সঙ্গে জোট বেঁধে ১৯৯৮ সালে এন ডি এ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল এখনকার এই বাম-কংগ্রেস জোট। এবারের নির্বাচনে আগমার্কা বামপন্থী সি পি এম দলই দক্ষিণে সাংসদ লাভের আশায় জয়ললিতার আঁচলে আশ্রয় নিয়ে জোট করেছে। বিজেপি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য কংগ্রেস এবং বামেদেরই দায়ী করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম দলের নেতা-মন্ত্রীরা বারেবারে চীনের মডেলকে গ্রহণ বা অনুকরণ করার কথা বলে থাকেন। সেই চীন-ই প্রতিবছর বিদেশে কালো টাকা গচ্ছিত রাখার শীর্ষে রয়েছে।

জি এফ আই-এর নির্দেশক রেমণ্ড বাকের বলেছেন, এই সমস্যা শুধু ভারতের একার নয়। ২০০৬ সালে বিভিন্ন উন্নত দেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা বেনামে গোপন একাউন্টে বিদেশে গচ্ছিত করা হয়েছে, তা সরকারি উন্নয়ণ সূচকের মোট আয়ের দশভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ উন্নয়ণও সেই অনুপাতেই কমেছে।

মূলত আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বিদেশে গচ্ছিত রাখা হয়। ওইসব দেশে আয়ের উৎস দেখানো বা আয়কর দেওয়ার কোনও কথা নেই। এককথায় এই ব্যাঙ্কগুলিকে গোপন ব্যাঙ্ক বলে অভিহিত করা হয়। বিশ্ব জুড়ে আর্থিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে গোপন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জি-২০-র বৈঠকে সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে একযোগে গোপন ব্যাঙ্ক আমানত বিষয়ে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে বলার জন্য সমবেত দাবি উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য, বেশির ভাগ কালো টাকা সুইস (সুইজারল্যাণ্ড) ব্যাঙ্কেই গোপন একাউন্টে জমা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টে কয়েকজন সুপরিচিত সুনাগরিক এব্যাপারে একটি জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা দায়ের করেছেন।

এই সপ্তাহের মধ্যেই (মে মাসের প্রথম) কেন্দ্রকে আদালতে জানাতে হবে সরকার বিদেশে গচ্ছিত টাকার বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিয়েছে। বিশেষ করে লিচেনস্টেইন-এর ব্যাঙ্কে যে ১৪০০টি একাউন্ট রয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। এই বিস্তারিত খবর জার্মানীর কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে। জি এফ আই-এর রিপোর্ট অনুসারে প্রতি বছর উন্নত দেশগুলো থেকে এক ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের অর্থ বিদেশে গচ্ছিত হচ্ছে।

সর্বাধিক সন্ত্রাসী হামলা ভারতে

(১ পাতার পর)

দক্ষিণ এশিয়াতেই সন্ত্রাসবাদ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকায় সহযোগিদের নিয়ে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদকে দমন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্বল সরকারের কারণে সন্ত্রাসবাদের রমরমা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। ফলে ২০০৭-এর তুলনায় ওই এলাকায় আমেরিকাবাসীদের জীবন ও স্বার্থের নিরাপত্তা কমে চলেছে। ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত করার জন্য সাংগঠনিক এবং আর্থিক পরিকাঠামো মজবুত। এখানে বলা যেতে পারে, আমেরিকা পাকিস্তানকে সন্ত্রাস সমনে যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, কার্যত পাকিস্তান তা দিয়ে ভারতে সন্ত্রাসবাদী ঢুকিয়ে প্রক্সি-ওয়ার চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে ভারত দীর্ঘদিন আমেরিকার কাছে অভিযোগ করলেও আমেরিকা কোনও গা করেনি।

আমেরিকান রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তান নানা অবৈধ উপায়ে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। ভারতীয় গোয়েন্দারা প্রমাণ পেয়েছেন, মুম্বাইয়ে ২৬/১১-র সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য পাক-সন্ত্রাসবাদীরা ক্রেডিট কার্ড, হাওলা এবং বিদেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতে ব্যাপক অর্থ আমদানি করেছিল।

আমেরিকান রিপোর্টে ভারতে মাওবাদীদের উগ্র হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে।

মাওবাদীদের ডেকে আনে সিপিএম-ই

(১ পাতার পর)

৫১ বছর বয়সী কোটেশ্বর রাও দলের সামরিক শাখার প্রধান পরিচালক। বাংলা, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত ও সীমান্তবর্তী এলাকায় তিনি ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দিতে ব্যস্ত রয়েছেন— তাদের ভাষায় জঙ্গল-মহলের এক মুক্তাঞ্চলে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে গণহত্যা কাণ্ডের আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাদের টার্গেট ছিলেন না। শালবনী ও নয়াচরে তারা বিরোধিতা করবেন বলে জানিয়েছেন কোটেশ্বর রাও। তার কথায়, সিঙ্গুরে রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জোর করে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার গরীব বনবাসীদের উচ্ছেদ করছে। সেজন্যই তারা লড়াই চালিয়ে যাবেন, মোকাবিলা করবেন।

তবে পশ্চিম মেদিনীপুরের সি পি এম নেতৃত্বের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়েছে কোটেশ্বর রাওয়ের গলা থেকে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক দীপক সরকার, তমলুকের সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ এবং লালগড়ের অনুজ পাণ্ডেরা চরম অত্যাচারী ও উৎপীড়ক। তারা সর্বত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণ চান। মানুষকে গ্রাহ্যই করেন না। এরকম লোক ও তাদের তল্পিবাহকরাই আমাদের টার্গেট— বললেন কোটেশ্বর।

তারা রাজনৈতিকভাবে মানুষের অন্তর জয় করার সৎসাহস হারিয়ে ফেলেছেন। তারা পুলিশকে সঙ্গে করে গ্রামে ঢোকে আর গভীর রাত্রে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায়। তারা সম্প্রতি 'গণতন্ত্র সুরক্ষা সমিতি' গঠন করেছে, আর পুলিশ তাদের পোস্টার বিলি করে— স্পষ্ট ভাবেই কোটেশ্বর রাও এসব জানিয়েছেন।

সিপিএম-তৃণমূল টক্কর

(১ পাতার পর)

দুষ্কর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলে। সিরাজুল ক্ষমা চাইতে নারাজ হলে তাকে বেদম প্রহার করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি নিতান্তই স্থানীয় ছোট ঘটনা। এমনই ঘটনা ঘটেছে উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায়। সেখানে হিন্দু মন্দির, হিন্দু পরিবার-পরিজন আক্রান্ত হয়েছে। খবরের কাগজে এবং টিভি সংবাদ চ্যানেলে সেসব খবর ব্ল্যাক আউট করা হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের কড়া হুকুমে। কিন্তু এসব করে কী মুসলিম তোষণের বিষফোঁড়া সমাজের শরীরে ফুটে বেরনো বন্ধ করা যায়! যে কোনও সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত তোল্লাই দিলে দেশ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

অতীতে মণ্ডল কমিশন দেশবাসীকে তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। মণ্ডল কমিশনকে শিখণ্ডী খাড়া করে মায়াবতী, লালু, মুলায়মরা আজও দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছেন। জাতপাতের কৌশলী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মহাগুরু ভারতের কমিউনিস্টরা। লালু-মূলো-মায়াদের সহজেই চেনা যায়। বোঝা যায়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ধবজাধারী এই কমিউনিস্টরা চিরকালই কট্টর সাম্প্রদায়িক। এই কমিউনিস্টরাই একদা মুসলিম লীগের ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গঠনের দাবির সোচ্চার সমর্থন করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের এই কট্টর সমর্থকরাই এখন 'গোর্খাল্যাণ্ড' গঠনে আপত্তি জানাচ্ছে সেকুলার বুলি কপচিয়ে। এরাই নেপালীদের সঙ্গে বনবাসীদের লড়িয়ে দিচ্ছে। জাতি-দাঙ্গায় প্ররোচনা দিচ্ছে। এর পরিণাম যে কতটা ক্ষতিকর তার পরিচয় অচিরেই রাজ্যবাসী জানতে পারবেন।

দার্জিলিংয়ে বিজেপির সম্ভাবনা উজ্জ্বল

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

রাজ্যের প্রথম দফার নির্বাচন রক্তাক্ত। নির্বাচনী কর্মী নিহত - বহু আহত। আতঙ্কগ্রস্ত জঙ্গল মহল। অভিযোগ উঠেছে মেদিনীপুরের কেশপুরে বুথ দখল করেছিল সিপিএম।

প্রথম দফা নির্বাচনের প্রধান একটি দিক হল দার্জিলিং-এর পাহাড় এলাকায় সিপিএম ঢুকতে পারেনি। ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে। পাহাড় এলাকায় মোট ভোটার সাড়ে পাঁচ লক্ষ। দার্জিলিং-এর সমতলে ভোটার ছয় লক্ষ। এখানে ৬৫-৭০ ভাগ ভোট পড়েছে। যতই কমিউনিস্টরা বঙ্গভঙ্গের কথা বলুক দার্জিলিং-এর গোর্খা সমস্যার সমাধান একান্তই প্রয়োজন। কমিউনিস্টরা একদা জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়ে ছোট ছোট রাজ্য গঠনের কথা বলতো। তবে দার্জিলিং-এর ভোটের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে করা যেতে পারে যে — এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের সম্ভবনা উজ্জ্বল।

কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে তাঁরা জানালেন যে — "ভোট বয়কটের স্লোগানে সিপিএম-এরই লাভ হয়েছে।"

কিছুদিন আগেই বামফ্রন্টের সভার পর এক অভিনব সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল — যেখানে বামফ্রন্টের সব নেতাই বক্তৃতা করে দেখালেন বামফ্রন্টের ঐক্য অটুট। অথচ এই সভার আগেই ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সুপ্রিমো অশোক ঘোষ বলেন যে, নন্দীগ্রামের জন্য সিপিএমই দায়ী। নন্দীগ্রামে গুলি-চালনার অর্ডার মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন।" এর জবাবে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী কি ঘাস খান? যে, গুলি চালনার আদেশ দেবেন?" পরে লেনিনের মূর্তির পাদদেশে বুদ্ধ-বিমান-অশোক ঘোষ-এর ভাই ভাই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

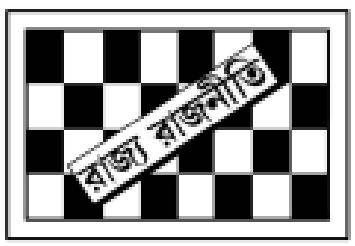

কিন্তু প্রতিটি জেলায় নীচের তলায় ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা সিপিএম-কে পরাজিত করার প্রচারই করছেন। উলুবেড়িয়াতে তো জনৈক ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রী — সিপিএম প্রার্থী হান্নান মোল্লাকে পরাজিত করার জন্য আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন! শুধু অশোক ঘোষ কেন — অশোক ঘোষের পরই আরএসপি মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী বলেন — "সিপিএম ক্যাডাররা পুলিশের উর্দি পরে নিরীহ মানুষদের উপর গুলি চালনা করেছিল নন্দীগ্রামে।" ক্ষিতিবাবু আরও বলেন — নন্দীগ্রামের কলঙ্কের সব ভার সিপিএম-এর। শুধু ক্ষিতি গোস্বামী নন, আর এস পি-এর শ্রমিক নেতা — কৃষক নেতা নব প্রকাশিত এক ইংরেজি মার্কা বাংলা দৈনিকে লিখেছেন — "সিপিএম শ্রমিক-কৃষক স্বার্থ বিরোধী। পুঁজিপতিদের দালাল।"

সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, নীচের তলার আরএসপি কর্মীরা সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ভোট করবেই।

এদিকে বিভিন্ন এলাকার যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রটি সিপিএম-এর খরচের খাতায়। বারাসাত কেন্দ্রটিও অনিশ্চিত।

তৃণমূলের অঘোষিত মুখপত্রে রহস্যজনকভাবে মহঃ সেলিম এবং লক্ষ্মণ শেঠের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনামূলক প্রচার সংবাদ প্রকাশ হয় না কেন?

শোনা যাচ্ছে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওই কাগজের জনৈক সাংবাদিকের পুত্রের একটি ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি না করে দেওয়ার ফলেই উক্ত সাংবাদিক সুদীপবাবুর বিরুদ্ধে বেআইনি ঘর দখলের সংবাদ লেখেন এবং তিনিই নাকি ক্ষোভে এখন সুদীপ পিছিয়ে পড়েছেন বলে লিখছেন।

ভোটের দিনে দার্জিলিংয়ের একটি বুথে ভোটদাতাদের দীর্ঘ লাইন।

অন্য রকম

বিশ্বাস ভোট

মাত্র একটা ভোট। যা পাল্টে দিতে পারে সরকার। বদলে দিতে পারে সমগ্র দেশ। বদলায় জনগণ। বদলায় আপনার জীবন-যাত্রা। ভোট-রাজনীতির এই আপ্তবাক্যটা তাদেরও ভালোরকম জানা। জানা আছে ভোটের গুরুত্বও। তবে পূর্ব পুরুষদের হাত ধরে এই পদ্ধতির শুরু। তারপর থেকে আর থেমে থাকেনি। ভোট এলেই বসে বৈঠক। ঠিক হয় কে হবেন গ্রামবাসীর দ্বারা নির্বাচিত।

গ্রামের মানুষের ভোট — উন্নয়ণ যার, ভোট তার। ফলে এখানে কোনও রাজনৈতিক বাগ্-বিতন্ডা নেই। নেই কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষও।

এমন নয় যে, গ্রামে কোনও তা আগে থেকে জানতেও পারেন না। খাঁটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ভোটের ফল উঠে আসে ইভিএম মেশিনে। সত্যিই অভিনব গণতন্ত্র।

আকারে আয়তনে ছোট্ট রনওয়াড়ে গ্রাম। গ্রামের মানুষ এই গণতান্ত্রিক নির্ণায়ক পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছে। একদা যে গ্রামে উন্নয়ণের ছিটে ফোঁটাও ছিল না। এখন সে গ্রাম উন্নত হয়েছে। গ্রামের কচি-

ভোটের আগে বৈঠকে গ্রামের প্রমুখরা।

রনওয়াড়ের বাসিন্দাদের কাছে ভোটের সংজ্ঞাটা অন্যরকম। গণতন্ত্রের মানুষই একজোট হয়ে ঠিক করে জনাদেশ। ভোটের ইভিএমের রায় তারা ভোটের আগেই নির্ণয় করে ফেলে। তবে কি গণতন্ত্র এখানে গণতান্ত্রিক পথ হারায়?

রাজনীতির অন্যতম পীঠস্থান মহারাষ্ট্রের এক গ্রাম রনওয়াড়ে। এখানের গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ ভাবে ঠিক করে তারা কাকে ভোট দেবে। কে হবেন তাদের প্রিয় প্রার্থী। গ্রামবাসী এককাট্টা হয়ে তাকেই ভোট দেয়। তিনিই পান গ্রামবাসীর দায়-দায়িত্ব। গ্রামের প্রমুখরাই এই গুরুকাজটি করে থাকেন। এই রীতি আজকের নয়। রাজনৈতিক দল নেই, ইতি-উতি অনেক পরিবারেই দলের কর্মী রয়েছে। রয়েছে রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ পরিবারও। রনওয়াড়বাসীদের কাছে অবশ্য তার কোনও মূল্য নেই। তাদের কাছে দল বড় নয়। দলের যে প্রার্থী উন্নয়ণমুখী সেই হবে গ্রামের জনতার প্রতিনিধি।

গ্রামবাসীরা কোনও নেতা-কর্মীকে দরজায় দরজায় নির্বাচনী প্রচার করতে দেয় না। তারা গ্রামের মন্দিরে জননেতাদের আহ্বান জানায় — তাদের বক্তব্য রাখার জন্য। সেখানেই নেতারা বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত গ্রামবাসীরাও তা শোনেও। তবে গ্রামের রায় ঠিক হয় গোপনে। জননেতারা কাঁচাদের জলে ভিজে স্কুল করতে হতো। এখন সে সমস্যা নেই। বড় স্কুল তৈরি হয়েছে। সরকারি টাকায় গ্রামবাসীরা চাষ-অবাদের জল পাচ্ছে। গ্রামে বড় মুদিখানা দোকান তৈরি হয়েছে। নির্মাণ হয়েছে অত্যাধুনিক হাসপাতাল।

এসবই সম্ভব হয়েছে গ্রামবাসীর এক্কাট্টা রায় থেকে। এবারের ভোটেও গ্রামবাসীরা একত্রে বসে ঠিক করে ফেলেছে — গ্রামের ২৯০টি ভোট কার পক্ষে যাবে। এমনই জানালেন গ্রামে উপ-সরপঞ্চ পান্ডুরঙ্গ আম্বেকর। রনওয়াড়ের এই পদ্ধতি সত্যিই অবাক করেছে অনেককে।

মন্দ দিয়ে মন্দকে জায়েজ করার রাজনীতি

সোহরাব হাসান

চারমাস বয়সী মহাজোট, প্রযত্নে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য একেবারে কম নয়। পূর্ববর্তী চারদলীয় জোট সরকার যেখানে সবকিছুতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগত, মহাজোট সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাড়াহুড়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারপরও বলব শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারটি অনেক বেশি সক্রিয়, তৎপর। গত তিন মাসে আটা ও চালের দাম তারা প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কমেছে তেল সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও। হয়তো অনেকে আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দেবেন। তারপরও স্বীকার করতে হবে সরকার চালের দাম কমাতে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে দেশের গরীব ও স্বল্প আয়ের মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিয়ে আসতে একাধিক কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশের মতো খাদ্য ঘাটতি ও বিপুল জনসংখ্যাধিক্যের দেশে লাখ লাখ শ্রমিকের জন্য রেশন চালু এবং অতি দরিদ্রদের জি ডি এফ কার্ড বাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়।

মহাজোট ওরফে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই সংসদকে কার্যকর করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাও সব মহলে অভিনন্দিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে, যাতে বিরোধী দল সংখ্যানুপাতে সভাপতির পদ পেয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এ কমিটি গঠন করতে দেড় বছর সময় লেগেছিল। তারা বিরোধী দলের কোনও সদস্যকে সভাপতিও করেনি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হলে সেটি হবে সংসদীয় গণতন্ত্রে নতুন মাইলফলক। দ্বিতীয় অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অবিতর্কিত ব্যক্তিদের নিয়ে শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা গঠনও ছিল সাহসী পদক্ষেপ। বিশ্ব মন্দা মোকাবেলায়ও সরকার ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষজ্ঞ ও সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত টাস্কফোর্সও ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানেও সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। প্রয়োজনে নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে বিদ্যুৎ সমস্যাটি এতটাই প্রকট যে, সহসা এর সমাধান সম্ভব নয়। জোট সরকারের পাঁচ বছর এই খাতে কোনও অগ্রগতি নেই, মাইলকে মাইল খাম্বা বসানো ছাড়া, সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন সবাই।

আমরা জানি যদিও এই বিচার বন্ধ করতে দেশি-বিদেশী একাধিক মহল তৎপর। পাকিস্তানের একজন মন্ত্রী ঢাকায় এসে বলেছিলেন, এটি এ সময়ের অগ্রাধিকার নয়। অন্যদিকে সৌদি আরবও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার অনুরোধ জানিয়েছে বলে পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে। সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা

খালেদা

গতি ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তদুপরি সামরিক অভিযান না চালিয়ে রাজনৈতিক উপায়ে বি ডি আর বিদ্রোহ দমনও দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সবকিছু ভেবে, কম ক্ষতির বিনিময়ে সঙ্কট মোকাবেলাই কাম্য। শেখ হাসিনার সরকার সেই কাজটি করছে। সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ ওঠেনি। যদিও একজন মন্ত্রী তার অফিস সাজাতে মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছেন। কোনও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার দায় এই সরকারের নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় বলে যে অভিযোগ ছিল, শেখ হাসিনার সরকার তাও কাটিয়ে উঠেছে। ছয়টি আসনের উপনির্বাচন এক শতভাগ অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। সেনাবাহিনী না নামিয়েও যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা যায়, তা এবার প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেমন দৃঢ় ছিল, তেমনি সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপও লক্ষ্য করা যায়নি। পরবর্তী নির্বাচনগুলো অবাধ ও সুষ্ঠু হলে পরীক্ষায় নকলের মতো নির্বাচনে নকলবাজির -সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। সেক্ষেত্রে বিতর্কিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু শুরু থেকে যে সমস্যাটি শেখ হাসিনার সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলেছে, তা হল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস ও মাস্তানি। বি এন পি— জামায়াতের পাঁচ বছরের শাসনামল কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজনৈতিক সঙ্কটে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। তাদের কর্মকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই সীমিত ছিল। শেখ হাসিনা যখন কারাবন্দী তখনও আওয়ামী লীগের নারী কর্মীরা মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে সাব জেলের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু ছাত্রলীগের বীর পুরুষদের দেখা পাওয়া যায়নি। কিন্তু নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে নিষ্ক্রিয় ছাত্রলীগ হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঊনত্রিশ ডিসেম্বর ০৮' নির্বাচনে বি এন পি জামায়াতের যেভাবে ভরাডুবি ঘটেছে তাতে তাদের সমর্থক ছাত্রসংগঠন, ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি ক্যাম্পাসেই ছাত্রদল ও শিবিরের তৎপরতা সীমিত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সিন্দাবাদের দৈত্যের ন্যায় আবির্ভূত হয় ছাত্রলীগ নামক সংগঠনটি। আর ক্যাম্পাসে যেহেতু প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলো নিষ্ক্রিয় এবং বিগত পাঁচ বছরের অপকর্মের জন্য তাদের নেতা কর্মীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপগুলোই হানাহানিতে লিপ্ত। ছাত্র রাজনীতি এখন হল দখল, টেণ্ডারবাজি, কমিশন-বাজিতে রূপ নিয়েছে। যেখানে শিক্ষা, আদর্শ ও নীতির কোনও বালাই নেই।

প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ছাত্রলীগের এই সন্ত্রাসকে পার্লামেন্ট গভর্ণমেন্ট পার্টি (পি জি পি)-র কাজ বলে অভিহিত করেন। প্রশ্ন হল যারা এতদিন জিয়া, খালেদা জিয়ার নামে জিন্দাবাদ দিয়েছে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া সংগঠনে ঢুকল কি করে? এর পেছনে নিশ্চয়ই কিন্তু আছে। আছে ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্ন। মাস দুই আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র দল একজোট হয়ে শিবিরকে

পিটিয়েছিল। কারণ চাঁদার অঙ্ক তারা তিন ভাগ করতে রাজি নয়। দুর্ভাগ্য যে, ছাত্রনামধারীদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এক শ্রেণীর শিক্ষকও মদত দিয়ে চলেছেন। এতদিন প্রধানমন্ত্রীর মৃদু ধমক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নরম তিরস্কার কিংবা দলের মুখপাত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সদুপদেশও কোনও কাজে আসেনি। কাজে আসেনি জাহাঙ্গীর - নগর, জগন্নাথ কিংবা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেও। যারা সন্ত্রাস ও খুনোখুনিতে অভ্যস্ত তারা নেতার উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফয়সালকে মধ্যযুগীয় কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। তিন তলা থেকে ফেলে দিয়েই সন্ত্রাসীরা ক্ষান্ত হয়নি, তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে নীচে নেমে ছুরিকাঘাত করেছে। ছাত্র লীগের লাগাম টেনে ধরতে সম্প্রতি আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলী বৈঠকে বসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। এক, শেখ হাসিনা আর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতা থাকবেন না। দুই, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ। আপাতদৃষ্টিতে দুটি সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক ধরে নেওয়া হলেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, জাতীয় সংসদের নেতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি কেন ছাত্রলীগের ন্যায় একটি সংগঠনের সাংগঠনিক প্রধান থাকবেন? আওয়ামী লীগের আরও কয়েকটি সহযোগী সংগঠন আছে। তিনি সবগুলোর সাংগঠনিক নেতা হলে দেশ চালাবেন কখন? হতে পারে ছাত্রলীগের মধ্যকার উপদলীয় কোন্দল ঠেকাতে তিনি সাংগঠনিক নেতা হয়েছিলেন। সহযোগী কোনও সংগঠন মূল দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব ছাত্রলীগের আদর্শের বন্ধন এতটাই শিথিল ছিল যে, সংগঠনের সুপ্রিমো এখন দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। দেশবাসী ছাত্রলীগকে প্রত্যাখ্যানের আগে দলের সভানেত্রী প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাংগঠনিক নেতার ধারণাটি এসেছে আওয়ামী লীগের ভাষার স্বৈরাচারের গর্ভে লালিত বি এন পি থেকে। এই দলের চেয়ারম্যান বা চেয়ারপার্সন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দলের

হাসিনা

মহাসচিব ঠিক করেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য বাছাই করেন। তিনি ছাত্রদলসহ সব সহযোগী সংগঠনের নেতা নির্বাচন করেন, জেলা-উপজেলায় কারা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক হবেন তাও ঠিক করে দেন দলের সুপ্রিমো। গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ একই স্বৈরাচারী নীতি কেন অনুসরণ করবে? জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী থেকে রাজনীতিতে এসেছেন। রাজনীতিকদের তিনি বিশ্বাস করতেন না বলে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগের ওপর সেই স্বৈরাচারী ভূতের আঁচড় কেন? শেখ হাসিনা তো দলে গণতন্ত্র আনতে চান। তিনি তো সরাসরি ভোটে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অছাত্রদের সংগঠনের বাইরে রেখেছিলেন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদও অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে।

অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। অছাত্র নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রসংগঠন চালানোর পরিণাম ভালো হয় না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা কতটা কার্যকর হবে, বলা কঠিন। পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনগণের জান ও মাল হেফাজত করা। এক্ষেত্রে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে তারা আইনগত ব্যবস্থা নেবে — এটাই স্বাভাবিক। এজন্য জনগণ তাদের বেতন-ভাতা দিচ্ছে। সেখানে বারবার নির্দেশ ও কঠোর হতে বলার প্রয়োজন হয় কেন? তাহলে কি এতদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছাত্রলীগের মস্তানিকে চোখ বুজে সহ্য করেছে? তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় সহযোগিতা করেছে? আমরা জোট সরকারের আমলে দেখেছি কোহিনুর বাহিনী বেছে বেছে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপরে চড়াও হয়েছে। ছাত্র দলের নেতা-কর্মীদের অপকর্মে সহায়তা করেছে। ক্ষমতার হাতবদলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও কি জনগণের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে দলীয় মস্তানদের প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছে?

আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রশাসনকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসর পর থেকেই প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। একটি কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, বি এন পি - জামায়াত সমর্থক কর্মচারী কর্মকর্তাদের দিয়ে প্রশাসন চালানো যায় না। প্রশাসনে যে বি এন পি-জামায়াতের সমর্থক কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য। এমনকি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। কিন্তু অনেকে চাকরি রক্ষার কারণে, অনেক দ্রুত পদ-পদবি পাওয়ার লোভে দলীয় লোক হয়ে যান। পুরনো দলীয়করণের বিরুদ্ধে নতুন দলীয়করণ নয়, ছাঁটাইর বিরুদ্ধে ছাঁটাই নয়, ও এস ডির বিরুদ্ধে ও এস ডি নয় — প্রশাসনকে নির্দলীয় ভাবে চলতে দিতে হবে।

তারা কোনও সরকারের বা দলের কর্মচারী নয়, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। সরকার দিনবদলের ঘোষণা দিয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের আস্থায় আনতে না পারলে সে কর্মসূচী বাস্তবায়ন হবে কীভাবে? সবাইকে বি এন পি জামায়াতের সমর্থক বানিয়ে পাইকারি রদবদলে প্রশাসনে আরও অচল অবস্থা দেখা দেবে।

সরকার নীতি নির্ধারকরা অবশ্য সবকিছুর মতো এক্ষেত্রেও জোট আমলের উদাহরণ টেনে বলেন, ওদের আমলে অনেক বেশি রদবদল হয়েছে ও এস ডি ছাঁটাই হয়েছে। ওদের আমলে হয়েছে বলে এদের আমলেও করতে হবে — এমন যুক্তি গণতন্ত্রে টেকে না। ওদের আমলে অন্যায় হয়েছে বলেই জনগণ এমনকী সরকারি কর্মকর্তারাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। গত নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট দেন তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ যে ২০০১ সালে ধানের শীষে দিয়েছিলেন তা কি অস্বীকার করা যাবে? প্রশাসনকে দলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললেই সমস্যা হয়। সরকারি কর্মকর্তারা সব সময় সরকারের প্রতি অনুগত থাকলেও দলের দৌরাত্ম্য মেনে নেন না। দল বাড়াবাড়ি করলে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী সচিবের কাছে তার পূর্বসূরী বেগম মতিয়া চৌধুরীর কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। জবাবে ওই সচিব সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্যার ওনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে লাভ নেই। তিনি আইনবহির্ভূত কোনও কাজ করেননি। এরপরই নাকি সাবেক কৃষিমন্ত্রীর কাজের তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অতএব পাইকারী হারে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সন্দেহের চোখে দেখা সমীচীন নয়। মন্ত্রী আইন মেনে চললে সচিবও আইন মেনে চলতে বাধ্য হন। সচিব অন্যায় না করলে অতিরিক্ত সচিবও অন্যায় করতে পারেন না। এভাবে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হয়। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে সেই উপদেশ মেনে চলতে হয়।

সরকারের বয়স মাত্র চার মাস। এরই মধ্যে সরকারি দলের অনেক নেতা-মন্ত্রীর চোখে মুখে মহাতৃপ্তির ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেন তারা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। তাদের কাছে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যার কথা জানালে বলেন, জোট আমলে এর চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। প্রশাসনে অস্থিরতার কথা তুললে জবাব দেন, ওদের আমলে অনেক আরও বেশি হয়েছে। তখন আপনারা চুপ ছিলেন।

আসলে কি তখন গণমাধ্যম, সাংবাদিকরা চুপ ছিল? ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকরা লিখেছিলেন বলেই হাওয়া ভবন, যুবরাজের দুর্নীতির খবর মানুষ জানতে পেরেছে। পত্রিকার পাতায়-ই জাতীয়তাবাদী মস্তানদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এখন সাংবাদিকরা সরকারের সমালোচনা করলেই জোট আমলের তুলনা দেওয়া হয়। জোট অন্যায় করেছিল বলেই জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন আওয়ামী লীগ নেতারাই ঠিক করবেন তারা বি এন পি-র পথ অনুসরণ করবেন না প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দিনবদলের রাজনীতি করবেন।

[সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ]

গণদেবতা সমীপেষু

কৃষ্ণচন্দ্র দে

"পশ্চিমবঙ্গে তানাশাহী চলছে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মানুষের অধিকার ভুলুণ্ঠিত করা হয়েছে — এ বক্তব্য বা ভাষণ কার জানেন? কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধীর। এখন প্রশ্ন, কেন এই বিলম্বিত বোধোদয়। দু'হাজার সাত সালের ১৪ মার্চের ঘটনায় রাজ্যপালের অবিস্মরণীয় প্রেস রিলিজ, যা কিনা তামাম পশ্চিমবঙ্গ-বাসীকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল, তা কি দশ নম্বর জনপথে পৌঁছায়নি? লাল সূর্যোদয়ের ঘটনায় যেখানে রাজ্যপালের দেওয়ালীর আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল তাও কি দশ নম্বর জনপথের ঘুম ভাঙ্গাতে পেরেছিল?

দিল্লীতে সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য সাড়ে চার বছর ধরে কংগ্রেস নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করে বসেছিল সি পি এম নামক এক পথভ্রষ্ট ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ, চ্যাংড়াদের দ্বারা পরিচালিত, বিদেশী ভাব ধারায় দীক্ষিত কিছু দালালদের কাছে। তাই আজ ভোটের মুখে যখন মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়ে ডিভোর্সের ডিক্রী ঘোষিত হবার পর জল্লাদ সি পি এমকে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ, এমনকী প্রণব মুখার্জীরও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে কঠিন কঠিন বাণ বর্ষণ, আমজনতা সন্দেহের চোখে দেখবেনই। এ ব্যাপারে মনমোহন সিং থেকে শুরু করে কংগ্রেস এর বিদেশী লিডার কিংবা নিউজ রিডার সকলেই নিজেদের হাস্যাস্পদে পরিণত করেছেন সন্দেহ নেই।

বর্তমান কংগ্রেস আর স্বাধীনতা পূর্বকালের মতো জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেই। বর্তমানে কংগ্রেস দলটি ইন্দিরাগান্ধী পরিবারের পরিবারতান্ত্রিক দলে পরিণত। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ কংগ্রেস দল সম্পর্কে নিস্পৃহ রাহুল গান্ধীকেই খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরেছে। একেবারে দেউলিয়া অবস্থা। ফল হয়েছে মারাত্মক। অকর্মণ্য দুর্বল নেতৃত্ব ভারতের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বারবার, রাজীবের আমল থেকেই যার শুরু। এরপর কখনও চন্দ্রশেখর কখনও দেবেগৌড়া আবার কখনও গুজরাল হয়ে বর্তমান মনমোহন সিং পর্যন্ত দুর্বল নেতৃত্ব ও অকর্মণ্যতার ট্রাডিশান সমান তালে চলেছে।

মধ্যখানে ভারতবর্ষ পেয়েছিল অটলবিহারীর মতো দক্ষ প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ। ওই পাঁচটি বছর ভারতের আমজনতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভুলেই ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যায় — অনুন্নয়ণের প্রশ্নে কখনও নয়। নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কখনও সি পি এম আবার শেষ লগ্নে মুলায়ম সিং এর দৌলতে কোনও রকমে অবস্থা সামাল দিতে পারলেও অনেকটা ল্যাজে গোবরে হয়ে অনৈতিক ডিল, ঘোড়া কেনা বেচায় পারঙ্গমতা দেখিয়ে টাকার জোরে অবস্থা সামাল দিয়ে কোনও রকমে মান রক্ষা করে ইউ পি এ সরকার। ভারতের আম জনতা সে সব দৃশ্য দূরদর্শনে প্রত্যক্ষ করেছে। ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নীতিহীন ভাবে সাংবিধানিক পদ প্রধানমন্ত্রীকে গুরুত্বহীন প্রক্সি-মুখ্যপ্রশাসক রূপে পরিণত করে প্রধানমন্ত্রী পদটাকেই হাস্যাস্পদে পরিণত করে ছেড়েছে। তারপর আবার ফোঁড়ার উপরে খাড়ার ঘা, এবারের ভোটে এন ডি এ-এর হয়ে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হয়ে নির্বাচনে সামিল হয়েছেন লৌহপুরুষ এল কে আদবানী। একা আদবানী মহাশয়ই কংগ্রেস তথা মনমোহন সিংকে অনেকটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছেন। তাবড় তাবড় কংগ্রেস নেতা থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধীও সেই ক্ষত মেরামত করতে পারেননি। এমনকী আদবানীজীর সঙ্গে দূরদর্শনেও কোনও বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পিছটান দিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে রণক্লান্ত সৈনিকের মতো পালিয়ে বেঁচেছেন। এই পালিয়ে বাঁচার চেষ্টাও কংগ্রেসের কাছে গৌরবের পশ্চাদপসরণ, এবং তার জন্য কতসব

সোনিয়া

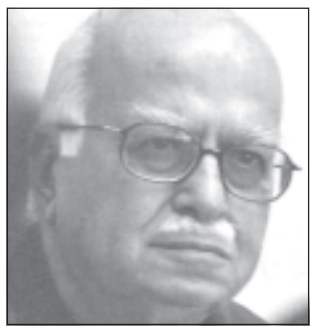

আদবানি

মনমোহন

আজগুবি হাস্যকর যুক্তির অবতারণা — এদেশটা তো আর আমেরিকা নয় যে, প্রধানমন্ত্রীপদে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি বসতেই হবে। কংগ্রেসীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে কাউন্ট ডাউন। তারা বেশ বুঝতে পারছে আদবানীজী তাদের অনেক মাইলেজ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং আবার ভোলবদল। প্রত্যেক নেতাদের মুখে আবার সি পি এমের সমর্থন নেবার কথা ঘোষণা। কেউ বলছেন — আমাদের দরজা সবার জন্যই খোলা। আবার কেউ বলতে শুরু করেছেন — সি পি এমের সমর্থন নিতে পারবো না, এই সর্তে মমতার সঙ্গে কোনও জোট বা কোনও সমঝোতা করা হয়নি। আবার তরুণ তুর্কি রাহুল গান্ধী বলেই ফেললেন — দরকার হলে সি পি এমের সমর্থন আমরা নিতেই পারি। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার কেউ আরও একটু মোলায়েম করে বললেন — আমাদের পুরানো বন্ধু যদি আবার ফিরে আসতে চায় আমরা ফিরিয়ে দেব কেন? অর্থাৎ আবার সেই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। তখন মমতা ব্যানার্জী কি করবেন? ভেবে রেখেছেন তো? আসলে কংগ্রেসীরা একান্তে নিজেদের কাছে স্বীকারও করছেন এই রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা। একা আদবানীজী শেয়ালে ছাগলে একঘাটে জল খাইয়ে ছাড়ছেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের অনুসন্ধানে যে তথ্য বেরিয়ে আসছে তার একটাই অর্থ — এ নির্বাচনে এন ডি এ আবার ক্ষমতায় আসছে। তাই বলছি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের বিদায় শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এন ডি এ এবং ইউ পি এ শাসনে শুধু মূল্যবৃদ্ধির খতিয়ান দেখলেই বিষয়টা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। (সারণী দ্রষ্টব্য)

এছাড়া বাজপেয়ীজীর আমলে কিছু সাফল্যের খতিয়ান :—

অতিদরিদ্র মানুষদের জন্য অন্ত্যোদয় / অন্নপূর্ণা যোজনার মাসিক ১৫ কেজি বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রদান, (২) অন্নপূর্ণা যোজনা ২ টাকা কেজি দরে গম ও ৩ টাকা কেজি দরে চাল প্রদান, (৩) জ্ঞানশ্রী শিক্ষা যোজনা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ১০০ টাকা ভাতা প্রদান, (৪) ৫০০ টাকা মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, (৫) ১২৭ দিন কর্ম নিশ্চয়তাপ্রকল্প, (৬) তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা অনুদান, (৭) বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা প্রদান, (৮) ইন্দিরা আবাস যোজনায় এককালীন ২০,০০০ টাকা প্রদান, (৯) অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেনশন যোজনা, (১০) চাইবা মাত্র গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ, (১১) ভারতে স্বর্ণালী চতুর্ভুজ চার লেনের রাজপথ নির্মাণ, (১২) বছরে এক কোটী মানুষের রোজগার যোজনা, (১৩) মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, (১৪) প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় প্রতি গ্রামে পিচের রাস্তা নির্মাণ, (১৫) সর্বশিক্ষা যোজনা, (১৬) প্রতিবন্ধীদের ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান, (১৭) কৃষক ক্রেডিট কার্ড প্রদান, (১৮) কৃষি বীমা ইত্যাদি।

১৯৭৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩২ বছর সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট শাসনে আইন-শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প গ্রামোন্নয়ণ প্রভৃতি প্রশ্নে রাজ্য সরকার সার্বিকভাবে ব্যর্থ। নির্লজ্জ দলবাজীই এই সরকারের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রশাসনিক উচ্চপদে আসীন সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী — ডি জি থেকে সচিব পদের সর্বস্তরের কর্মচারীরা সি পিএমের তল্পিবাহক ও ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। সি পি এমের শাসনে ও শোষণে পশ্চিমবঙ্গ শ্মশানে পরিণত। হাজার হাজার মানুষ খুন হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কর্মহীন বেকার যুবক, চাষী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কৃষক সমাজ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। জোরজুলুম করে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অপারেশন বর্গা নামে ভাঁওতাবাজী চলছে। সরকারি ক্ষমতা দখলে রাখার জন্য ভোট জালিয়াতি, রিগিং, বুথ দখল, ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরি, বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে হটিয়ে দেওয়া, নির্বাচনে দাঁড়ানো বিরোধী প্রার্থীদের হুমকি দিয়ে বাড়িতে সাদা থান পাঠিয়ে দেওয়া, সমস্ত পুলিশ কর্মচারীদের নিজেদের অনুকূলে এনে ভোটের নামে প্রহসন করা, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে না দেওয়া, মতের সামান্য অমিল হলেই বিরোধী কিংবা মাওবাদী তকমা সেঁটে দেওয়া এবং সর্বোপরি বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এইসব স্বৈরাচারী মনোভাব পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্রকে দুর্বল করে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। স্পেশাল অবজারভার আমানুল্লা সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশ পেলেই আমজনতার হাড়ে কাঁপন লাগবে। এর সঙ্গে জুড়ে গেছে প্রমোটার রাজের সঙ্গে পার্টি ক্যাডারদের অশুভ আঁতাত। মহল্লায় মহল্লায় একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখা যায় প্রায় অধিকাংশ ক্যাডার মাত্রই প্রোমোটারের সাপ্লায়ার না হয় তোলাবাজ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো।

	এন ডি এ (দাম প্রতি কেজি টাকায়)	ইউ পি এ (দাম প্রতি কেজি টাকায়)
সরষের তেল	৪৫/৫০	৮৫/৯০
আটা	৯	১৭
চাল	১০	১৬/৩৫
চিনি	১৪	২৭
চা	৮০	২০০
মুগডাল	২৪	৬০
মুসুর ডাল	২২	৭০/৭৫
পিঁয়াজ	৭	১৫
লবন	২.১৫	৭.৫০
মুরগী মাংস	৫৫	১২০
এল পি জি	২২৪	৩৪০
সিমেন্ট	১১৫	২৫০
দুধ	১৪	২২
বেসন	২২	৫০

কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভন্ডামী ও ভাঁওতাবাজী করে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই সংখ্যালঘুদের প্রকৃত উন্নয়ণ না করে, ভোটব্যাঙ্কের জন্য শুধুই তাদের তোষণ করে গেছে। কংগ্রেস এবং সি পি এম এদিক দিয়ে একই মুদ্রার এপিট ওপিট। মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিভেদ সৃষ্টি করে কেরলে মুসলিম লীগের সাথে একসঙ্গে সরকার গঠন করেছে। সর্বদাই সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলেও বি জে পি-কে সাম্প্রদায়িক বলে গালাগাল করে চলেছে যেন সব শিয়ালের এক রা। কিন্তু এতে বিজেপি-র ক্ষতি তো হয়নি, বরং বাড়বাড়ন্ত হয়েছে।

উভয়ের দ্বিচারিতার সাম্প্রতিক নমুনা মনমোহন সিং সরকার রক্ষার জন্য সি পিএমের কাছে নতজানু হয়ে সমর্পণ ভিক্ষা করছে। অপরদিকে পশ্চিমবাংলায় সি পি এম-এর বিরোধিতার ভন্ডামী করছে। কেন যে এরা মানুষকে এতো বোকা ভাবে! এর মধ্যে আবার নবতম সংযোজন কেন্দ্রীয় সরকার তেল— ঘুষ ও সাবমেরিন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে। সি বি আই-এর মতো প্রতিষ্ঠানকে নির্লজ্জ ভাবে ব্যবহার করে কত্রোচ্চির উপর থেকে রেড্ এলার্ট জারি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সি বি আই কত্রোচ্চিকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে করে সোনিয়া গান্ধীকে নববর্ষের উপহার দিল। স্বাধীনতার পর থেকেই গণতন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে কংগ্রেস। আর সি পি এম তো গণতন্ত্রই মানে না। অন্তত তাদের গুরুদেব মার্কস সাহেব-এর কাছে গণতন্ত্রের কোনও অবস্থানই নেই। শুধু ক্ষমতার লোভে সংশোধিত গণতন্ত্রকে মৌখিকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন একথা ঠিক। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মস্তানী নয়।

বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে আমজনতার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ভাব, একটা আবহাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই ভাষায় সকলেই সামিল হোন। গণতন্ত্রকে বাঁচান। না হলে আমরা আরো কাঙ্গাল হয়ে যাব। ভাবী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

সাক্ষাৎকার ঃ সব্যসাচী বাগচী

কেন্দ্রে সরকার গঠনে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সরকারকে দুর্বল করছে বামেরা

অর্ণব নাগ ।। এক মুহূর্তের জন্যও দম ফেলবার ফুরসৎ নেই তাঁর । দশ হাত, থুড়ি দু'হাতে সামলাচ্ছেন সব কিছু। রাজ্যের ৪২টি আসনেই বিজেপি প্রার্থী দেওয়ায় কর্মী-সমর্থকদের মনে অভূতপূর্ব উৎসাহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার যাবতীয় ঝক্কি মূলত পোহাতে হচ্ছে তাঁকেই। তিনি বিজেপির সফল ভোট ম্যানেজার কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী। ভিড়ে ভিড়াক্কার সাংবাদিক সম্মেলনে একের পর এক সাংবাদিকের আবদার মিটিয়ে চলছেন হাসিমুখে। এরই মধ্যে আবদার করলুম স্বস্তিকাকে একটি একান্ত সাক্ষাৎকার দেবার জন্য। তিনি এক নিমেষে রাজি।

স্বস্তিকার জন্য খুললেন আপন গহন মনের ডালি। আমরা তাই সাজিয়ে দিলাম আপনাদের জন্য।

স্বস্তিকা : এই মুহূর্তে রাজ্যে ভোটের হাওয়া কীরকম ?

সব্যসাচী বাগচী : বাংলায় ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণ হয়ে গিয়েছে। সিপিএমের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রয়েছে। মানুষ চাইছেন দিল্লীতে স্থায়ী সরকার। বাম-কংগ্রেস সরকারের অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে। তাতে তাঁরা বুঝেছেন কংগ্রেস বা ইউ পি এ-বাম সরকার নিয়ে দিল্লীতে সুদৃঢ় সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা চাইছেন বিজেপিকেই।

ক্ক আপনাদের বিরুদ্ধে ওঠা বঙ্গভঙ্গের অভিযোগের সামাল দিচ্ছেন কীভাবে?

ূ যারা বৃটিশ মদতে জিন্নার ভারত ভাগকে সমর্থন করে বাংলাভাগ করেছিলেন, তাদের মুখে এই বঙ্গভঙ্গের অভিযোগে হাসি পায়। দার্জিলিং নিয়ে গোর্খাস্থানের দাবি উস্কে দিয়েছিলেন এদেরই দলের রতনলাল ব্রাহ্মণ, আনন্দ পাঠক। সুবাস ঘিসিংকে সামনে খাড়া করে তাঁরা (বামফ্রন্ট সরকার) পাহাড়বাসীকে কোনও সুযোগ-সুবিধা দিতে পারলেন না। আমরা বঙ্গভঙ্গ চাইছি না, আমরা গোর্খাল্যান্ডও চাইছি না।

আমরা শুধু চাইছি একশ-দেড়শো বছর ধরে তাদের ওপর যে অবিচার, বঞ্চনা, শোষণ হয়ে এসেছে, সেই অবস্থায় পাহাড়ি, গোর্খা, রাজবংশীদের পাশে দাঁড়াতে। গোর্খা, রাজবংশী, কামতাপুরীদের ধারণা কংগ্রেস দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে বা বামফ্রন্ট দীর্ঘ ৩২ বছর তাদের কোনও চাহিদা পূরণ করতে পারেনি।

সি পি এম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। বেঁচে থাকার জন্য তাই তাদের অলীক কল্পনা করতে হচ্ছে। ওই ফ্রন্টের নেতা কে, প্রধানমন্ত্রী কে হবে, কটা আসন জিতবে কেউ জানে না। ওটা হল গদি পাওয়ার ফ্রন্ট। মায়াবতী, শরদ পাওয়ার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সবাই গদির জন্য দৌড়াচ্ছেন। ওই ফ্রন্টে সবাই আছেন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য।

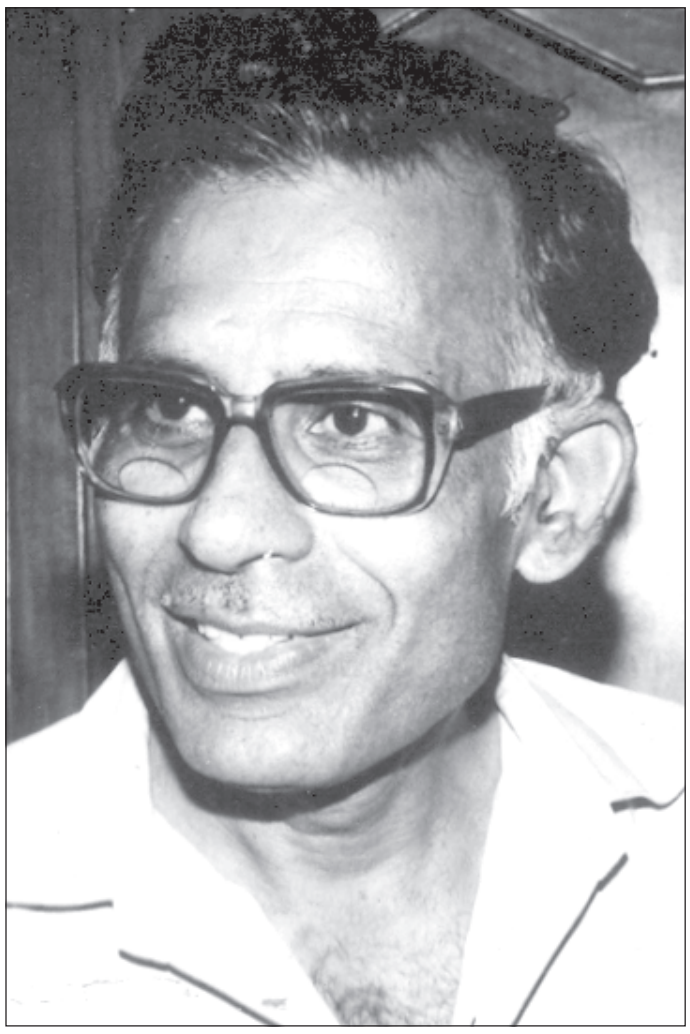

আর আমরা আমাদের Menifesto-তে খালি বলেছি, তাদের দাবি ‘‘Will examine this and consider appropriately their demand.’’

❐ বাংলায় এখনও অবধি কোন কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রচারে এলেন বা কারা আসবেন ? (গত ২৮ এপ্রিল গৃহীত হয় এই সাক্ষাৎকার)

❖ এখনও অবধি প্রচারে এসেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওঁরাও, ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, দলের মুখপাত্র রাজীব প্রতাপ রুডি ও হেমা মালিনী। এছাড়াও আসবেন নাজমা হেপতুল্লা, স্মৃতি ইরানি, সুষমা স্বরাজ, এল কে আদবানী।

❐ এতজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। প্রশ্ন হল, এটা তাঁরা কেন করছেন ? এতে তো এবারের মধ্যে বাম শাসনের অবসান অসম্ভব। তাহলে কারণটা কি ?

❖ আসলে আমরা মনে করি কেন্দ্রে সরকার গঠনে বামেরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত সরকারকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন বাংলার উপকারের স্বার্থে বাম জগদ্দল পাথরকে তুলে ফেলতে।

❐ কিছুদিন আগে সিপিএমের মুখপত্রে বাংলার পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে ভোটের পর তাঁদের দেখে নেওয়া হবে। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া ।

❖ এরকম হুমকি-ধমকি হল কমিউনিস্ট কালচার। ওরা কোনও শালীনতা মানে না। এরকম কমিউনিস্ট স্ট্যালিনিস্ট সন্ত্রাস করে তারা সোভিয়েত টিকাতে পারেনি। পূর্ব ইউরোপে টিকিয়ে রাখতেপারেনি। এই ফ্যাসিজমে তারা বাংলাতেও টিকতে পারবে না, স্রেফ কাজ না করে টিকে থাকার জন্য তাদের এসব করতে হচ্ছে।

❐ আপনার সঙ্গে কথা বললেই বিদেশের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। শ্রীলঙ্কায় জাতি সংঘর্ষ নিয়ে কী ভাবছেন ?

❖ ভারত সরকারের অবশ্যই তামিল স্বার্থ দেখা উচিত। শ্রীলঙ্কা সরকারের ওপর চাপ দিয়ে সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস বন্ধ করা দরকার। মোটকথা শ্রীলঙ্কায় তামিল উচ্ছেদ করা চলবে না। আমাদের কাছে খবর আছে পাকিস্তান ও চীন শ্রীলঙ্কাকে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করছে। চীন আসলে শ্রীলঙ্কাকে ভারত মহাসাগরে প্রহরী হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছে।

ইতিমধ্যেই আন্দামানের কোকো আইল্যান্ডে চীনা ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। নেপাল মাওবাদীদের হাতে। সব মিলিয়ে East-South Strategic Danger পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চীন আমাদের চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। এই চীনা আগ্রাসন রুখতেই হবে।

❐ এল টি টি ই তো একটি জঙ্গি সংগঠন ? তাদের রোখাটাও তো জরুরী ?

❖ অবশ্যই। আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদকে কখনও সমর্থন নয়। এল টি টি ই অন্য অধিবাসীদের চোখ রাঙাবে এটা হতে পারে না। দেশে শান্তি রক্ষার (আই পি কে এফ) জন্য রাজীব গান্ধী তড়িঘড়ি আমাদের সেনা সেই দেশে পাঠিয়েছিলেন। আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার।

শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব আমাদের শান্তির জন্য আরও বেশি প্রয়োজন। সেই সাথে দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরকে নিরাপদে রাখা।

❐ তৃতীয় ফ্রন্ট সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া ?

❖ আসলে সি পি এম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। বেঁচে থাকার জন্য তাই তাদের অলীক কল্পনা করতে হচ্ছে। ওই ফ্রন্টের নেতা কে, প্রধানমন্ত্রী কে হবে, কটা আসন জিতবে কেউ জানে না। ওটা হল গদি পাওয়ার ফ্রন্ট। মায়াবতী, শরদ পাওয়ার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সবাই গদির জন্য দৌড়াচ্ছেন। ওই ফ্রন্টে সবাই আছেন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য। ওতে ভারতের কিছু হবে না।

❐ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সব্যসাচীদা।

❖ স্বাগত।

ভোটদাতাদে

এন সি দে

কথায় বলে, বাঙালী কথা বলে বেশি। আর তাই ইংরেজরা বলত, বাঙালীরা চুপ করে থাকলেই, আমরা চিন্তিত হয়ে পড়তাম। সেই কারণে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের ইস্যু দিয়ে বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের আমরা ব্যাপৃত রাখতাম। কখনও বিধবা বিবাহ চালু করার আন্দোলন, কখনও সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আন্দোলন, কখনও বা বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজ ভেঙে খৃস্টান সমাজ অনুগামী প্রতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মসমাজ গড়ার খেলায় মাতিয়ে রাখতাম।

আবেগপ্রবণ এহেন বাঙালীর কথা শুনতে কয়েকদিন আগে অফিস যাত্রী বোঝাই শহরতলীর ট্রেনে চেপে বসেছিলাম। সকলেই নিত্য যাত্রী হওয়ায় সকলেই সকলের চেনা, কেউ কেউ আবার বন্ধুও বটে। এক বন্ধু খবরের কাগজ পড়ছিল মনোযোগ দিয়ে। তাকে খোঁচা দেবার জন্য আর এক বন্ধু বলল, কি রে কি পড়ছিস এত মনোযোগ দিয়ে। পড়েনে, আর কদিনই বা পড়বি, কদিন বাদেই তো বাংলা ছাড়া করে দেবে দিদি বলেছে। কথাটা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল খবরের কাগজ পড়া ছেলেটি। সে খেঁকিয়ে উঠে বলল, যা যা, বাংলাটা তোর দিদির পৈত্রিক সম্পত্তি না কি ? ভোটের পর দেখা যাবে কারা বাংলা ছাড়া হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব কতদিন থাকে দেখব !

আর এক বন্ধু টিপ্পনি কেটে বলল, কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিস। সাড়ে চার বছর ঘর করার পর ছাড়াছাড়ি হয়েছে তো, তাই একটু মনটা খারাপ আছে। তবে তোরাও কতদিন এর সঙ্গে ঘর করতে পারবি সন্দেহ আছে। আবার না আমে-দুধে এক হয়ে যায়। আর আঁটি গড়াগড়ি খায়।

তখন দিদি কোন্ দিকে যায় সেটাই দেখার। বিনা দোষে বিজেপি-কে যেভাবে ত্যাগ করেছিস, মনে হয় না বিজেপি আর কুলত্যাগীনীর সঙ্গে ঘর করবে।

তৃণমূল সমর্থক ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলে ওঠে — “সাম্প্রদায়িক বিজেপি’র সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এই কথা শুনে বিজেপি সমর্থক একজন বলে ওঠে “থাম থাম, কে সাম্প্রদায়িক আর কে ধর্ম নিরপেক্ষ আমাদের জানা আছে। মঞ্চে উঠে বক্তৃতা শেষে তোর দিদি তো আজকাল

রাজ্যে বামেদের আসন কমতে চলেছে

সতীনাথ রায়

রাজ্যের দু'দফা নির্বাচন শেষ হয়েছে। বাকি রয়েছে আর এক দফার। নির্বাচন হয়েছে অনেকটাই শান্তিপূর্ণ ভাবে। তবে ভোট মিটতেই ঝরেছে রক্ত। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুরের কুশবনির জঙ্গলে ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে তিনজন ভোট কর্মী। এছাড়া নির্বাচন নিয়ে অভিযোগও শোনা গেছে অনেকক্ষেত্রে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঘাটালে অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে। লোকসভার ভোট হলেও, এরাজ্যের ক্ষেত্রে ভোটের ফলাফল সব দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। ভোটের ফলাফলেই বামেদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। শুধু এরাজ্যের ক্ষেত্রে

দীর্ঘ ৩২ বছরের বাম শাসনে বামফ্রন্টকে এতটা অসহায়, এর আগে কোনও নির্বাচনেই দেখায়নি। দল পার্টির সহজপাঠটিও মিলাতে পারছে না।

নয়, সর্বভারতীয় স্তরেও। সেই সঙ্গে বিরোধীদের শক্তিও। প্রতিবারই নির্বাচনের আগে বামবিরোধী হাওয়া ওঠে। বিরোধীরা সরব হয়। শেষ হাসি অবশ্য হাসেন আলিমুদ্দিন কর্তারা। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। রাজ্য জুড়ে পালা-বদলের হাওয়া উঠেছে। বিরোধীদের শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকেই বামেদের কোণঠাসার চিত্র রাজ্যবাসীর কাছে পরিষ্কার। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের সমীক্ষায়, রাজ্যে বামেদের আসন কমার সম্ভাবনাই বেশি করে উঠে এসেছে। আমাদের বুথ ফেরৎ (স্বস্তিকা) সমীক্ষাও বলছে, রাজ্যে বামদের আসন কমতে পারে। প্রায় ২২টির কাছাকাছি। বিরোধীদের আসন বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বিজেপির দুই থেকে তিনটি আসন পাবার যোগ রয়েছে। দার্জিলিং-এ যশবন্তের জয় প্রায় নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন পাহাড়ি মানুষ। পাহাড়ে এবার ভোট দিয়েছেন প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ। আলিপুরের মনোজ তিগ্গার জয়ের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। একই আশা রয়েছে কৃষ্ণনগর-এর প্রার্থী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। সেখানকার স্থানীয় মানুষও একই কথা বলছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্টে এমন চিত্র ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন এজেন্সি দিল্লীতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তাতেও বামেদের আসন কমার ইঙ্গিতরয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে খোদ আলিমুদ্দিন ম্যানেজাররাও যথেষ্ট চিন্তিত। ইতিমধ্যেই দলের গোপন বৈঠকগুলিতেও আসন কমার আভাষ পাওয়া গেছে। দলকে আসন বাড়াতে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত ঘন ঘন বৈঠক ডাকতে হয়েছে। দল 'গ্রাম চলো' সহ একাধিক কার্যসূচী হাতে নিয়েছিল। তবুও আশা কম বলেই মনে করছেন অনেকে।

দীর্ঘ ৩২ বছরের বাম শাসনে বামফ্রন্টকে এতটা অসহায়, এর আগে কোনও নির্বাচনেই দেখায়নি। দল পার্টির সহজপাঠটিও মিলাতে পারছে না। সিঙ্গুরের মেঘ দেখছেন দলীয় কর্মীরা। ১৯৮৪ থেকেও খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে শাসক দলকে — এমনই মনে করছে রাজ্য -রাজনীতি মহল। সেবার ৪২টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই। জ্যোতি বসু নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দিতে বলেছিলেন, 'মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে ভোট দিয়েছেন'। কিন্তু এবার সুরসুরিতে চিড়ে ভেজার আশা কম। শাসক দল নিজেই সমস্যার পাহাড় তৈরি করেছে। একদিন যে স্লোগান, ইস্যুকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল, আজ সেগুলিই ব্যুমেরাং হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসছে। বাংলার লাল দুর্গে ভাঙন ধরেছে। একদা বাংলার ঘরে ঘরে লাল ঝান্ডা শোভা পেত। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, নীচুতলার মানুষও সিপিএম বিরোধী হয়ে উঠেছে। অথচ এদেরই হাত ধরে মসনদে বসেছিল ফ্রন্ট। বুদ্ধিজীবী মহলও বাম বিরোধী। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ 'পরিবর্তন চাই' বলে হোর্ডিং লাগিয়েছে। একই অবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও। সাচার কমিটির রিপোর্টে তাদের চৈতন্য হয়েছে। মুসলিমরা

রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ণের মুখ দেখতে পায়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শুধু মাদ্রাসার উন্নয়ণেই মেতেছেন। অথচ এরাজ্যের শিক্ষিত মুসলিম মা-বাবারা চান না তাদের সন্তান মাদ্রাসায় যাক। ফলে উন্নয়ণ হয়েছে ফাঁকা কলসির আওয়াজের মতো।

দলের মধ্যেও শুরু হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। কাকাবাবুদের হাত ধরে যে নেতৃত্ব উঠে এসেছিল, তা আজ অমিল। মার্ক্সবাদ দর্শন হারাচ্ছে — নেতৃত্বের গুণে। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো নেতা দলে নেই। কয়েকদিন আগে আপশোষের সুর শোনা গিয়েছিল বিমান বসুর কণ্ঠে। তিনি পাঞ্জাবী সেলাই করে পরলেও, লক্ষ্মণ শেঠের মতো নেতারা দামী পোশাক পরেন। নেতাদের গলায় সোনার হার, হাতে আঙটি। মুখে তাম্বুল। এই তো মার্কসবাদীদের বাহ্যিক রূপ। যারা মার্কস পড়েনি, লেনিন বোঝে না, তারাই আজকের মার্ক্সবাদী। দলের বড় নেতা। যে মার্ক্সবাদীরা বলত 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। 'গঙ্গা যদিও মেকং হয়, মেকং নয় তোমার লাল সেলাম'। আজ এই স্লোগান পথ হারিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দলের স্লোগান ছিল — 'পেন্টাগনে কামান দাগো'। এখন দলই টাটা-বিড়লাদের ভজনা করছে। চাষীদের উদ্দেশ্য বলা হত 'চাষী দে তোর লাল সেলাম, লাল নিশানে'। চাষীরা আর এই স্লোগানে সাড়া দেয় না। কারণ তারা দেখেছে নন্দীগ্রাম। প্রত্যক্ষ করেছে সিঙ্গুর। চোখের সামনে দেখেছে কৃষক হত্যা।

রাজ্যে পালা বদলের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছে ২০০৬-এর ২৫ সেপ্টেম্বর। সিঙ্গুরের বিডিও অফিসের সামনে পুলিশের লাঠি চার্জ। গ্রেপ্তার করা হয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষক অনুরাধা তলোয়ার, মেধা পাঠেকর প্রমুখকে। ১৮ ডিসেম্বর প্রতিবাদী তাপসী মালিকের মৃতদেহ এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে আরও জোরাল করে। ২০০৭-র ০৬ জানুয়ারি, সিপিএম-এর হার্মাদ বাহিনীর গুলি প্রাণ কেড়ে নিল বিশ্বজিৎ, ভরত মন্ডলের মতো তরতাজা প্রাণের। তেখালি ব্রিজের এপার থেকে ওপারে চলেছে গুলির লড়াই। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। ১৪ মার্চ সূর্যোদয় হল। নতুন সূর্যকে সাক্ষী রেখে বাংলার মানুষ শপথ নিল বাম হঠাও, দেশ বাঁচাও। বুদ্ধর কালো হাত গুড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও। এই জনরোষের ফল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে শাসকদল। ২০০৩-এ বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে ২৮৬টি আসনে জিতেছিল। ২০০৮-এ এক ধাক্কায় তা নেমে গেছে। ১৮৭ টিতেই শুধু দখল রাখতে পেরেছে তারা। নন্দীগ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪ হাজার ভোটে হারা প্রধান বিরোধী দল ৪০,০০০ ভোটে জয়ী হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিরোধীরা ভালো ফল করেছে।

৪ হাজার ২৫০ টিতে হারা টিএমসিপি বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩ হাজার ৩৯৫টিতে জিতেছে। সুজাপুরেও বামফ্রন্টের হাল খারাপ হয়েছে। অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে স্কুল কমিটির নির্বাচনে। নীচুতলায় পর্যন্ত ধস নেমেছে।

দেশ জুড়ে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মতো ঘটনা সিপিএমকে নরহত্যার নায়করূপে প্রতিপন্ন করেছে। এক ধাক্কায় বামবিরোধী ছাতার তলায় দাঁড়িয়েছে মানুষ। বিজেপির সুদক্ষ নেতৃত্ব দেশের সামনে সিপিএমের নরহত্যার রূপ তুলে ধরেছে। সংসদের ভিতর ও বাইরে তারা আন্দোলন চালিয়েছে। রাষ্ট্রপতিরও দ্বারস্থ হয়েছিল এনডিএ। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি'র কঠোর বিরোধিতা করেছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লালগড় সমস্যা বাম বিরোধী হওয়ায়,

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মতো ঘটনা সি পি এমকে নরহত্যার নায়করূপে প্রতিপন্ন করেছে। এক ধাক্কায় বামবিরোধী ছাতার তলায় দাঁড়িয়েছে মানুষ।

আগুনে ঘি দেওয়ার কাজ করেছে। আন্দোলন ছড়িয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া মেদিনীপুরের মতো লাল দুর্গেও। যেখানে বামেদের শক্ত ঘাঁটি। জনজাতি মানুষও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব। জনজাতিরা একদিন সিপিএম-কে তাদের আশা-ভরসা ভেবেছিল। লালগড় আন্দোলন তাদেরও বিরোধী করে তুলেছে। বুদ্ধিজীবী থেকে জনজাতি সবাই নির্বাচনে বাম বিরোধী হওয়ায়, ইভিএম-র পরবর্তী রায় বাম আসন কমালে, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ আসন কমার অশনি সঙ্কেত দিয়ে রেখেছে, আমাদের সমীক্ষাতেও বাম আসন কমছে।

তাদের কড়চা

এন সি দে

খোদা হাফিজ বলছে। মঞ্চে ইসলামি টুপি পরিয়ে মোল্লাদের বসিয়ে রাখছে;ঘন্টায় ঘন্টায় মঞ্চের উপরেই নামাজ পড়াচ্ছে; রিজওয়ানুরের মা'কে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেন এদেশে প্রেম-ভালোবাসার শিকার ওই একজনই হয়েছে;ওই রমজান মাসে মাথায় টুপি পরে মুসলমানদের সঙ্গে উপবাস ভঙ্গ করছে আর হিন্দু-সন্ন্যাসীরা সারা চৈত্রমাস জুড়ে যে সন্ন্যাস পালন করে সারাদিন উপবাস পালন করছে, সেদিকে কোনও দৃষ্টি নেই। কি জানি মুসলমান ভোটের জন্য নীরেট গোঁড়া মুসলমানদের তুষ্ট করতে নিজের নামটাই না পাল্টে "মমতাজ" করে ফেলে।

বিজেপি সমর্থক যুবকটি আরও বলে যে সেই সম্ভবতঃ ৯৮-৯৯ সালে বাজপেয়ীজী সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে বলতে উঠে বলেছিলেন, "ধর্মনিরপেক্ষ" কথাটির অর্থ ধর্মহীনতা বা বিরোধিতা নয়। এর অর্থ সর্বপন্থ ও ধর্মের সমাদর। তাই আমরা ধর্মনিরপেক্ষ নই। কারণ আমরা সব ধর্মের সমাদরের পক্ষে। তোদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এই উদ্দেশ্যে এমন এক গোঁড়া তালিবানী সম্প্রদায়কে তোষামোদ করছে যার ভবিষ্যৎ ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। যারা রাষ্ট্রের নাম দেয় ধর্মের নামে, যাদের কাছে রাষ্ট্রীয় আইন আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বজনগ্রাহ্য নয়, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় গোষ্ঠীর শরিয়তি আইন বলবৎ-এর চেষ্টা। একদিন এ রাজ্যে মুসলিম লীগের সুরাবর্দী রাজত্ব করে গেছে, তার চূড়ান্ত পরিণতিতে হয়েছিল বড়দ্ব Great Calcutta Killing। কে জানে কোনও এক নয়া সুরাবর্দী সুযোগের অপেক্ষায় আছে ক্ষমতা দখলের। এবারের সুরাবর্দী হবে আরও ভয়ানক।

সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম সমর্থক যুবকটি বলে ওঠে, ঠিক বলেছেন, দিদি এখন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব দেখছে। তার জন্য যা করতে হয় তাতেই তিনি রাজি। 'কত রঙ্গ দেখব মা তোর'। যে কংগ্রেস একদিন ওকে বিতাড়িত করেছিল;যে কংগ্রেসকে 'ও' একদিন সিপিএমের 'বি-টিম' বলত,সাধারণত সেই কংগ্রেসের সঙ্গে এখন পেয়ার-মহববত চলছে।

তৃণমূল যুবকটি যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। সে বলে উঠল, সি পি এম-বিজেপি যে দেখছি এখন এক সুরে কথা বলছে — ব্যাপার কী? বিজেপি'র হয়ে কী দেওয়ালে পদ্মফুলও আঁকছিস না কি? আর উপায় কী? বিজেপি ভোট পেলেই তোরা জিততেপারিস।

বিজেপি সমর্থক যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে। বলে, "তোদের আগে মনে ছিল না বিজেপি-কে বাদ দিয়ে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার সময়? বিজেপি তো সব সময় বলে এসেছে যে সিপিএমকে হারাতে হলে সকলকে নিয়ে মহাজোট গড়তে হবে। এ ব্যাপারে কোনও ছুঁৎমার্গ বিজেপি দেখায়নি। কিন্তু কংগ্রেস সব সময় বলে এসেছে বিজেপি'র সঙ্গ ত্যাগ না করলে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও জোট নয়। শেষ পর্যন্ত মমতা কংগ্রেসের এই ফাঁদে পা দিয়েছে। কংগ্রেস জানে এর ফলে সি পি এম বহু সিট পাবে। আর এটাই সে চায়। কারণ কংগ্রেসের কাছে তৃণমূলের চেয়েও সি পি এম অনেক বেশি নির্ভর যোগ্য বন্ধু। সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস তবু সাড়ে চার বছর সরকার চালাতে পেরেছে। দিদিকে নিয়ে সাড়ে চার মাসও নির্বিবাদে চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ! তাই বিজেপি ভোট পেলে সিপিএম জিতে যাবে বলে বিজেপি কি তার পার্টি তুলে দিয়ে বনবাসে চলে যাবে

(এরপর ১৩ পাতায়)

জয় ভোট ঠাকুরের জয়

আসন্ন পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনে "ভোট ঠাকুর" একটা ব্যাপারে কামাল করে দিয়েছেন। ঠাকুর সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। মনে মনে যাই থাকুক না কেন, ভোট ঠাকুরের নিকট মাথা নত করিয়ে নেওয়ার, পূজা পাওয়ার ব্যাপারে, স্নানজল খাওয়ার ক্ষেত্রে এক অভিনব কান্ড ঘটিয়ে ছেড়েছেন।

প্রথম থেকে ধরা যাক, সাধারণত নার্গিস বেগমের ক্ষেত্রে মুসলিমরা, শুধু কেন, সর্বক্ষেত্রেই একুট গোঁড়া। সেই নার্গিস বেগম হিন্দুদেবী সর্বমঙ্গলা মায়ের নিকট পূজা দিতেও দ্বিধা করেননি। সত্যি ভোট ঠাকুরের কী মহিমা? এই ব্যাপারে, অবশ্য কোনও সোরগোল হয়নি, এখন মুসলমান সমাজ কী ভাবে নেবে এটাকে। অবশ্য হিন্দু নেতা-মন্ত্রীগণ ভোটের জন্য যেভাবে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কার্যসূচী নিচ্ছেন, তাই বোধ হয় সংখ্যালঘুরা এখনও চুপচাপ। তবে কতদিন থাকে নার্গিস বেগমের পূজা দেওয়া ব্যাপারে দেখা যাক।

এবার আসি সদ্য স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে দলত্যাগী (সিপিএম থেকে) আবু আয়েস মন্ডলের কথায়। উনি নির্বাচনে নিজে জেতার জন্য কোনওবার কোনও মন্দিরে গেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সিপিএমকে হারাবার জন্য উনি মন্দিরে যেতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। যখন সিপিএমে ছিলেন তখন সিপিএমের মুখোস খোলার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু যেই কিনা শুনলেন ওনাকে টিকিট দেওয়া হবে না, অমনি উনি সিপিএমের দুর্নীতি দেখতে পেলেন, খুঁজে পেলেন মুখোস খুলে দেওয়ার রসদ।

নাস্তিক সিপিএমের সদস্য হয়েও অবশ্য নিজের সংখ্যালঘুর যাবতীয় ধর্মীয় আচরণ পালন করতে পিছপা ছিলেন না। হিন্দু দেবতা হনুমানজীর মন্দিরে গিয়ে ভোটযুদ্ধে জয়লাভের আশায় হনুমানজীর স্নানজল পান করে ভোট ঠাকুরের নিকট মানত করতেও দ্বিধা করেননি। এবার কিন্তু সংখ্যালঘুরা এটাকে ভালো চোখে না দেখে সহজে মেনে নেয়নি। তারা সেলিম সাহেবের পাশে থাকবে না অর্থাৎ ওনাকে ভোট দেবেন না বলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এতবড় স্পর্ধা। হিন্দু দেবতার স্নানজল খেয়ে ইসলামের অবমাননা। সেলিম সাহেব একটু ভড়কে গেছেন। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। স্নানজলটা তো আর বার করে ফেলে দেওয়া যাবে না। ওটা রক্তে মিশে গেছে। তাই পড়েছেন মহা ফাঁপরে। ওই সব কট্টর সংখ্যালঘুদের কথা ও বক্তব্য শুনলে স্বভাবতই মনে পড়ে যায় ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য কলিমুদ্দিন সামসের কথা। উনি বলেছিলেন 'আমি প্রথমে মুসলিম, তারপর ভারতীয়।' কট্টর সাম্প্রদায়িক না হলে একথা বলা যায় না।

এবার আসা যাক গণি খান চৌধুরী বংশের নির্বাচনী প্রার্থী মৌসমের কথায়। অনেক জলঘোলা হওয়ার পর ওনার মনোনয়ন গ্রাহ্য হওয়ায় উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যথাসময়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া মাঙলেন এবং পরে সংখ্যাগুরুর মন্দির অর্থাৎ 'মনোস্কামনা মন্দিরে' গিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য প্রার্থনা করলেন। এবার অবশ্য এখনও সংখ্যালঘুদের তরফ থেকে কোনওপ্রকার হুজ্জোত হয়নি। কি জানি পরে হবে কি না।

সুতরাং ভোট ঠাকুরের কেরামতি আছে বাপু। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে পদতলে এনে ফেলেছেন। তাই আমরা ভোটাররা ঐক্যতান করি — 'জয় ভোট ঠাকুরের জয়'।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

বিভাজনের রাজনীতি

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে কংগ্রেস দলের ব্লক ও জেলা স্তরের পদাধিকারীদের সমাবেশে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বললেন, "রাম নামে যারা দেশের মানুষকে বিপথে চালিত করছে, তারা কখনও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার উপযুক্ত শক্তি হতে পারে না।" রাম রাজনীতিকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন "বিভাজনের রাজনীতি" বলে।

তাহলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার উপযুক্ত শক্তি কি কংগ্রেস হতে পারে? যদি হয় তবে স্বাধীনতার দিন থেকেই — কংগ্রেসই তো প্রায় বেশির ভাগ সময় ক্ষমতায় ছিল। তাহলে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হল কেন? সামান্যতম সময়ের জন্য জনতা দল, বিজেপি কি ক্ষমতায় থাকতেই সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি? মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিপথে পরিচালিত করছে কে? কংগ্রেস না বিজেপি? আজ কংগ্রেস সভানেত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী যাই বলুন, ভারতকে খণ্ডিত করাতেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম।

মহম্মদ আলি জিন্নার দাবি ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজ্য। এই দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে কংগ্রেস ভারত ভাগ করল। জিন্না সাহেব পৃথক রাষ্ট্র পেলেন। চারিদিকে যখন জঙ্গি হানা হচ্ছে, তাদের বাসভূমি যখন পাকিস্তান, ভারত পাকিস্তানকে বলছে, জঙ্গিদের ভারতে পাঠিয়ে দাও — এখানে বিচার হবে — পাকিস্তানের সুদৃঢ় ঘোষণা, জঙ্গি ফেরৎ নয়, যদি কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে ভারত বলুক তার বিচার এদেশেই (পাকিস্তানে) হবে। পাকিস্তানের একাধিক সংগঠন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলে পদদলিত করেছে। এটা কি ভারতকে চরমতম অপমান নয়। বিতর্কিত বাবরি কাঠামো ধ্বংসে যাদের চোখে বয়েছিল অশ্রুবন্যা — আজ পদদলিত ভারতের জাতীয় পতাকা দেখে তাঁরা কি বলেন? যে কংগ্রেস দল ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করল — অথচ ভারতকে সর্বধর্ম সমন্বয়-এর পীঠস্থান করল সেই কংগ্রেসের কণ্ঠে "রাম রাজনীতি বিভাজনের রাজনীতি" ছাড়া আর কি উচ্চারিত হতে পারে।

সুবলচন্দ্র পাখীরা, পুরুল, হাউর, পূর্ব মেদিনীপুর।

বাংলার ন্যানো রঙ্গ

বাজারে ন্যানোগাড়ি এসেছে। বুকিং চলছে। এর সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে চলছে ন্যানো বিখ্যাত শিল্পাচার্য বুদ্ধ দেব এবং কৃষি কন্যা মমতাকে নিয়ে নানা রকম আলোচনা-সমালোচনা-রঙ্গরস। নাট্যকারের নাটকে রতন টাটা ন্যানো গাড়ির বিজ্ঞাপন দিয়ে কি সস্তায়ই না কিস্তিমাৎ করলেন। কোথাও এখনও ন্যানোগাড়ির কারখানাই চালু হয়নি, অথচ অন্যান্য কারখানা থেকে দু-চারটা গাড়ি তৈরি করে এনে প্রদর্শনী কক্ষে বাংলার নির্বাচনী বাজার একদম জমজমাট করে তুললেন। এর সঙ্গে সামিল হয়েছে এক শ্রেণীর পণ্য পয়সাওয়ালা হুজুগে বাঙালী। তাদের মুখে শুধু ন্যানো আর ন্যানো। শুধু কি তাই। রেলগাড়ির নিত্য যাত্রীগণও হারিয়ে ফেলেছে তাদের প্রতিদিনের গল্পগুজব। তাদের মুখেও শুধু ন্যানোগাড়ি এবং ন্যানো বিখ্যাতদের নিয়ে হাস্য পরিহাস। এমনি নানা কারণেই একলাখি ন্যানো এখন হয়েগেছে দেড়লাখি। সত্যি এবারের লোকসভা নির্বাচনে দুর্ভাগ্য, সি পি এম তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্যসব দলের। তাদের কথা কেউ মুখেও আনছে না। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে এক সহযাত্রী বললেন, মশাই চাটনি মুখে থাকলে কি অন্য কোনও খাবার মুখে দেওয়ার ইচ্ছা হয়? এ বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। কথায় কথা বাড়ে ভোজনে পেট বাড়ে। আমরা এই দুটোর কোনওটাই বাড়াতে চাই না। ন্যানোগাড়ি করে যতখুশী ভোট সংগ্রহ করুক মহামান্যগণ। এর ফলে সংবাদ মাধ্যমেরও একঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে গেলো। কত বড় বড় ন্যানো বিজ্ঞাপন পেয়েছেন তারা? সারাদিন ন্যানো বাবুদের পেছনে না ঘুরলে কি এসব পেতেন তারা সত্যি, টাটা কোম্পানী যে একদম ঝানু ব্যবসায়ী তা মোটেই অস্বীকার করা যায় না। গাড়ি নির্মাতা সংস্থা জাপানের ম্যাকিগো এবং প্যারি কোম্পানীর মাথায় হাত বুলিয়ে বুদ্ধ দেব বাবুর নাট্যমঞ্চে কতবড় একটা ন্যানো বিপ্লবের নাটক করে দেখালেন। আমাদের স্বনামধন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট রূপকার জ্যোতি বসু লন্ডন থেকে রাশিয়ান বিপ্লব আমদানি করেও এত অল্প সময়ে বাজার গরম করতে পারেননি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ধনতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করে তারপর বাজিমাত করেছিলেন। অথচ বাংলার শিল্পাচার্য বুদ্ধ দেব বাবু কত চটপট কৃষি কন্যা মমতার সহযোগিতায় সারা ভারতে ন্যানো বিপ্লব সংঘটিত করলেন। এখন একদম দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষও এক কথায় বলবেন — ওঃ ন্যানো, পয়সা হলেই নেবো একটা। তবে ইন্দোনেশিয়ার ক্যামিক্যাল বিপ্লব আমদানী নিয়েই বুদ্ধ দেববাবু পড়েছেন মহাসমস্যায়। তবে সবুরে না কি মেওয়া ফলে। কংগ্রেসের মধ্যে অনেক রথী-মহারথী আছেন, যারা এখনও বলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সি পি এম শরণং গচ্ছামি। আর ন্যানো কারখানা যেখানেই হোক, বাজারে বাজিমাত করার কৃতিত্ব বুদ্ধ দেব আর মমতার। অতএব বাজারে আসবে ন্যানো, যত খুশি কেনো।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

কোন পথে ভারতীয় নারী

ভারতীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ 'স্বস্তিকা'র ১৮ ফাল্গুন, ১৪১৫-তে(২.৩.০৯) প্রকাশিত মুনমুন বিশ্বাসের 'কোন পথে ভারতীয় নারীরা' প্রবন্ধটি ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিল আমাকে।

সত্যই 'পাঞ্চালী' নামক চরিত্রটি আমাকে নিয়ে গেল বঙ্কিমের উপন্যাস জগতে— নারীরা যেখানে শক্তিক্ষয়ী রমণী নয়, শক্তিদায়িণী মা, অর্ধাঙ্গিনী অথবা ভগিনী। মনে করুন না সন্ধ্যাদেবী তার নিজের ডানা ছড়িয়েছে, প্রদীপ হাতে একটি গৃহবধূ এই মাত্র তুলসী মঞ্চে প্রদীপ রেখে প্রণাম করে উঠছে, মাথায় রক্তাভ ঘোমটা, দীপের আলোকে যেন মুখ তার উদ্ভাসিত রবি অথবা মনে মনে অনুভব করুন একটি গ্রাম বাংলার নব বিবাহিত বধূ — মাথায় সিঁদুর, হাতে শাখা, কপালে সিঁদুর ফোঁটা আর এঁদের সামনে দাঁড় করান নব বিবাহিত দ্বন্দ্বে, যিনি হাতে শাখা রাখেন না, রাখেন মোবাইল, পরিধেয় বস্ত্র কাপড় নয় জিন্স ও টি সার্ট। এবার আপনি সুস্থ মনের মানুষ — কোনটি গ্রহণ করবেন!'

'পাঞ্চালী চরিত্রটি যখন তার মাকে শাখা-সিঁদুর পরতে বলে, তার মাম্মি বলে উঠে "ওসব ক্যারি করতে পারব না।" আমি ব্যক্তিগতভাবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এগুলিকে আবার বহন করতে হয় নাকি!

'মা' একজন 'মা' — একটি মেয়ের কাছে আদর্শ। এই 'মা'-গুলি কি আমাদের ভারতীয় নারীর আদর্শ? ভারতীয় নারী মানে লজ্জাশীলা বধূ শুধু নয়, দরকারে তিনি লক্ষ্মীবাঈ, খনা, গার্গীও বটে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের কথা শুনলে বা আচরণ দেখলে সত্যই ব্যাথা বোধ হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শুধু কি নারীরাই গা ভাসিয়েছে, ছেলেরা কি এর প্রভাব থেকে মুক্ত আছে? বোধ হয় না। ছেলেদের মধ্যে আর কই বেরিয়ে আসছে বিবেকানন্দের, সুভাষ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। আদর্শ 'আর্য' যে নিজ তেজে দীপ্ত হবে এমন ব্যক্তি তৈরি হচ্ছে কোথায়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে ছেলেরাও আজ নিজের স্থান থেকে সরে এসেছে।

মাননীয়া লেখিকা প্রতিবেদনের সমাপ্তিতে বলেছেন, "চাই শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয়করণ, পাঠ্যক্রমে মোড়া শিক্ষা (স্বামী রামদেব কর্তৃক নির্দেশিত হলে ভালো), মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি।" আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সমর্থন করি প্রতিটি বর্ণকে। 'গীতাঞ্জলী' কাব্য গ্রন্থের 'প্রার্থনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছেন এমন এক স্বর্গ রাজ্যের, যেখানে মানুষের মন হবে ভয়শূন্য, মিথ্যা আচার-বিচার থেকে বেরিয়ে মানুষ নিজেকে মেলে ধরবে 'মানুষ' রূপে — আমরাও স্বপ্ন দেখি রবি কবির মতো — এমন এক ভারতবর্ষ যেখানে মানুষ ভারতের প্রাচীন পরম্পরার কোলে বড় হবে এবং উন্নত আর্য সমাজ নির্মাণ করবে।

অর্ণব ঘোষ, যদুপুর, মালদা।

কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রণবানন্দ ব্যায়াম মন্দির

গত ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি আধুনিক ব্যায়ামাগার (জিম) উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ক্ষীরোদ গোপাল সাহার পরিচালনায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি প্রাণবন্ত ব্যায়ামাগার চলতো। কালক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি তা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সহ স্থানীয় কিছু সমাজসেবীর আগ্রহে পুনরায় আধুনিক রূপে চালু করা হল।

এদিন পূজাপাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই আধুনিক ব্যায়ামাগারের নামকরণ হয় প্রণবানন্দ ব্যায়াম মন্দির। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দ ছাড়াও, দিলীপ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক

সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী প্রমুখ। যুবকদের স্বাস্থ্য চর্চায় এই ব্যায়ামাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন।

বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর স্মরণসভা

গত ১৭ এপ্রিল বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, লোকপ্রিয় জননেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ভাষা পরিষদের নির্দেশক তথা বিশিষ্ট সমালোচক ডঃ বিজয় বাহাদুর সিংহ, অধ্যাপিকা ডঃ বসুমতি ডাগা, অধ্যাপিকা ডঃ ইন্দু যোশী,সভার সভাপতি ছিলেন মোহনলাল পারীক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সুশীল ওঝা, যুবক রাজনেতা অশোক ঝা, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজীর ভাইপো-বিধুশেখর শাস্ত্রী ও কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাপতি ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সমাবেশ সমাচার

স্বধর্মে পরাবর্তন

গত ২৭ মার্চ বর্ষপ্রতিপদ তিথিতে দক্ষিণ অসম প্রান্তের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার উমরংশু শহরে এক পরাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই অনুষ্ঠানে কাপিলি চা বাগানের শ্রমিক শ্রীমতী রীণা ভৌমিক স্বধর্মে ফিরে আসেন। বৈদিক নিয়ম-রীতিতে তিনি নিজধর্ম ফিরে পান। এদিন তাঁর সঙ্গে চা-শ্রমিক মনভট্ট ওরাওঁ-এর বিবাহও অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কার্যকর্তারা নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন।

পরম্পরা

বুদ্ধ জনক রাজা শুদ্ধোধন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায়রে —'

হ্যাঁ, এও তো এক ধরনের প্রেম — ভালবাসা। বাৎসল্যের অমিয় ধারায় নিষ্ণাত পিতৃহৃদয়ের এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

বিচিত্র এ অনুভূতি। একদিকে হৃদয় হরণ আনন্দ, অন্যদিকে অন্তরবিদীর্ণ করা শঙ্কা।

ও কি সেই!

অথবা —

না, আর ভাবতে পারেন না রাজা শুদ্ধোধন। নামে রাজা হলেও তথাকথিত কোনও রাজতন্ত্রর প্রতিনিধি তিনি নন। একটি গণতান্ত্রিক প্রদেশের নির্বাচিত নায়ক তিনি। প্রাচীন ভারতের শাক্য-গণতন্ত্রর এক সার্থক নেতা রাজা শুদ্ধোধন। পৃথিবীর যিনি হবেন অধীশ্বর — সেই তথাগত বুদ্ধের জনক তিনি। তাই শুধু রাজা নন, তিনি যে রাজাধিরাজ!

সেই রাজা শুদ্ধোধন নিজের মানসিক আবেগকে আর ধরে রাখতে পারেন না।

আশ্চর্য এই আবেগ। একদিকে সারা বিশ্বের অধ্যাত্ম জগতের অধিনায়কের জনক হবার অপার আনন্দে নন্দিত এই আবেগ। পর মুহূর্তেই সন্দেহ, সত্যিই কি তাই। তাঁর পুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ কি সত্যিই একজন অবতার পুরুষ —! ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ! অথবা স্বয়ং ঈশ্বর।

এই আনন্দ আর সন্দেহের ঢেউয়ে উথাল-পাতাল শুদ্ধোধন। অবশেষে ডাকলেন দেশের ব্রহ্মজ্ঞ সব পণ্ডিত এবং জ্যোতিষীকে। তারপর সেই সমবেত বুধমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলেন তিনি, আপনারা বলছেন, আমার ছেলে একজন মহাপুরুষ — অবতার পুরুষ। আপনাদের এ কথায় চিত্ত নেচে ওঠে— বর্ষার মেঘ দেখে নেচে ওঠা ময়ূরীর মতোই। নৃত্য পাগল ছন্দে নেচে ওঠা সেই হৃদয়ই প্রশ্ন তোলে, এসব কি শুধুই কথার কথা। সত্যিই কি গৌতম আমার মহাপুরুষ। আর সেই কারণেই বলছি, শুধু মহাপুরুষ বা অবতার বললেই হবে না। প্রমাণ দিন কোন কোন লক্ষ্মণ দেখে তাকে অবতার বলছেন — তা প্রকাশ করুন।

রাজার কথায় সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। একরাশ বিস্ময়ে তাঁরা যেন অভিভূত। তাই কোনও কথা সরে না মুখ দিয়ে। শুদ্ধোধন বলেন, অবতারের লক্ষ্মণ প্রমাণিত না হলে, আমি যে এক অবতার পুরুষের পিতা, একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। দোহাই, অকারণ সন্দেহে অস্থির করে রাখবেন না। প্রমাণ দিন।

এবার সরব হন পণ্ডিতরা। বলেন, আপনার কথাই রাখবো। পূরণ করবো আপনার ইচ্ছা। প্রমাণ করবো অবতার পুরুষের কোন্ কোন্ লক্ষণ রয়েছে আপনার পুত্রের মধ্যে।

রাজা উৎফুল্ল, রাজা উদ্বিগ্ন। একদিকে অবতার পুরুষের পিতা হবার গৌরবের আনন্দ, অন্যদিকে ভয়, যদি সব মিথ্যা হয়। আশা, এই পণ্ডিতরাই তো এর আগে স্বপ্ন বিচার করে বলেছিলেন, এই পুত্রের জন্মের সাতদিন পর মৃত্যু হবে মাতা মায়া দেবীর। সত্য হয়েছিল সে কথা। তাই এবারই বা মিথ্যে হবে কেন? প্রবোধ দেন নিজেই নিজেকে।

অবশেষে এলো সেই দিন। আবার বসল বুধসভা। উৎসুক রাজা এবং উপস্থিত সকলের কৌতূহল দূর করে বুধমণ্ডলীর

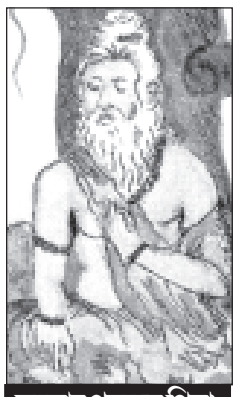

অবতার পুরুষের পিতা

প্রধান বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্র সিদ্ধার্থর মধ্যে রয়েছে বত্রিশ রকম অবতার পুরুষের লক্ষণ এবং আশি রকম অনুব্যঞ্জন লক্ষণ।

পণ্ডিতদের একথায় আনন্দঘন রাজা শুদ্ধোধন বলেন, শুধু সংখ্যা দিয়ে বোঝাবেন না, বিশদ ভাবে বলুন সব — ব্যাখ্যা করুন আপনাদের কথা।

তবে শুনুন মহারাজ, কেন আমরা বলছি আপনার পুত্র সিদ্ধার্থকে এক অবতার পুরুষ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন। বলুন আপনারা, আমি যে আর এই হৃদয়কে ধরে রাখতে পারছি না। দোহাই আপনারা ব্যাখ্যা করুন। উত্তরে তাঁরা যেসব লক্ষণীয় কথা বলেন, তা হল —

মাথায় উষ্ণীশের চিহ্ন, কৃষ্ণবর্ণ কেশ, দক্ষিণ দিকে আকুঞ্চি ত তা। সমতল ললাট, চোখ তাঁর নীল, সুমধুর কণ্ঠস্বর, সুগোল উরুদেশ, দীর্ঘ আঙুল, হাত পা রেখাজাল সমন্বিত। এই রকম ৩২টি লক্ষণ এবং আশিটি অনুব্যঞ্জনের কথা শোনালেন তাঁরা।

বিদগ্ধ পণ্ডিত ও গণকদের কথায় পুলিকিত রাজা শুদ্ধোধন। পুত্র তাঁর অবতার, মহাপুরুষ — এই বোধে স্থির হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসলেন তিনি।

রাজা শুদ্ধোধন আনন্দিত। আবার তিনি চিন্তিত। বয়স বাড়ছে সিদ্ধার্থর কিন্তু কেমন যেন বিমনা। নজর নেই বিলাস বৈভবে। সব সময় কেমন যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। সিদ্ধার্থ-র এই নিস্পৃহতা উদাসীনতাই ভাবিয়ে তোলে রাজা শুদ্ধোধনকে, সেই ভাবনা নিয়ে কথা হয় তাঁর আরেক পত্নী গৌতমীর সঙ্গে। বিমাতা হয়েও রাজার নির্দেশে গৌতমীই যে মাতৃহৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলেছেন সেই সাতদিন বয়সে মাতৃহারা সিদ্ধার্থকে। গৌতমীর সঙ্গে আলোচনা করেই শাক্যরাজ্যের পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিশ্বামিত্রকে নিয়োগ করেন সিদ্ধার্থর শিক্ষক হিসেবে।

সবসময় আনমনা অথচ পাঠগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী সিদ্ধার্থর মেধা ও বুদ্ধির প্রখরতায় মুগ্ধ বিশ্বামিত্র। অল্প দিনের মধ্যেই সিদ্ধার্থ আয়ত্ত করে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণীয় সব বিদ্যা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান। উপনিষদ ও বেদান্তের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাণী আত্মস্থ করে রাজকুমার জানতে চায় এই দুয়ের মর্মবাণীর কথা। তার এই জিজ্ঞাসায় অসুবিধায় পড়েন বিশ্বামিত্র। উত্তর তাঁর জানা, কিন্তু রাজার নির্দেশ এসব বলা যাবে না কুমারকে। তাই তিনি একদিন সিদ্ধার্থকে নিয়ে রাজার কাছে এসে বলেন, শিক্ষা শেষ কুমারের। কুমার এখন সর্বজ্ঞ।

বিদ্বান সিদ্ধার্থকে রাজা এবার পাঠান সৈনিক শিক্ষায়তনে। সেখানেও ঘোড়ায় চড়া, ধনুবির্দ্যা, অসি চালানা সমেত সমস্ত যুদ্ধ বিদ্যায় সকলকে ছাপিয়ে যায় সিদ্ধার্থ। সব প্রতিযোগিতায় অনায়াসেই জয়ী হয়। তার সাফল্যে আনন্দিত, গর্বিত শুদ্ধোধন।

কিন্তু সিদ্ধার্থ সব বিদ্যাবিশারদ হয়েও যে সব সময় উন্মনা। তারুণ্যের প্রাণ-চাঞ্চ ল্য নেই তার মধ্যে, বৈরাগ্যের গৈরিকি রং তার চোখে — অন্তরে-অঙ্গ ভঙ্গিমায়। উদ্বিগ্ন রাজা, পিতা হয়েও পুত্রকে নারী সঙ্গে লিপ্ত করতে, কামনায় উদ্বেল করতে রাজ্যের প্রধান প্রধান সুন্দরী নৃত্য পটিয়সীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয় তারাও।

সকলের পরামর্শেই অপরূপ, প্রায় বিদ্যাধরী দণ্ডপাণি কন্যা গোপার সঙ্গে বিয়ে দেন তিনি সিদ্ধার্থর। জন্ম হয় তাদের পুত্র রাহুলেরও। কিন্তু জগৎকে যিনি শান্তি, ত্যাগ মৈত্রী আর অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করে দেখাবেন — পরিনির্বাণের পথ, তিনি তো আবদ্ধ থাকতে পারেন না সংসারের বন্ধনে। তাই একদিন সব ছেড়ে পথকে আশ্রয় করেন সিদ্ধার্থ। কঠোর সাধনার মাধ্যমে বোধি লাভ করে হন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ।

তারপর বিশ্ববিমোহন বুদ্ধ দেবকে এবার শাক্য রাজ্যপুরী কপিলাবস্তুতে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান রাজা শুদ্ধোধন। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তিনি। দীর্ঘ ন'বছর পরে হল পিতা-পুত্রের মিলন। চোখের জলে পুত্রকে অভিষিক্ত করলেন রাজা। শুনলেন তাঁর মত ও পথের কথা। পথিক হলেন সেই পথের। পিতা হয়েও পুত্রের নির্দেশে গৌরববোধ করেন তিনি। অবতার পুরুষ বুদ্ধ জনক রাজা শুদ্ধোধন ত্যাগের মন্ত্রের দীক্ষিত হয়ে সেদিন থেকে এগিয়ে চলেন পরিনির্বাণের পথেই। ধন্য রাজা শুদ্ধোধন। ধন্য তাঁর শুদ্ধ চিত্ত।

আমাদের ভাবধারা

শারীরিক ভোজন ও আত্মিক ভোজন

চৈতালী চন্দ

শারীরিক সুস্থতার জন্য দরকার আহার, বিহার, ব্যায়াম ও ঔষধি।

আহার : শুদ্ধ নিরামিশ আহার গ্রহণ করতে হবে। সকালের জলখাবার (Breakfast) খুব ভালো করতে হবে। দুপুরের আহার মাঝামাঝি ও রাতের আহার খুব কম। দুধ, দই, অঙ্কুরিত ছোলা, সব্জি, ডাল ইত্যাদি যেন খাবারের তালিকায় থাকে। রাতের খাবার রাত ৮ টার মধ্যে শেষ করতে হবে। শোবার ও খাবার আগে ঘন্টা দুই-এর ব্যবধান থাকবে। বিকেলে কোনও একটা ফল প্রতিদিন খেতে হবে।

বিহার : বিহার অর্থাৎ নিদ্রা, ৬ থেকে ৮ ঘন্টা প্রতিদিন ঘুম দরকার। ৩ ঘন্টা ৫ ঘন্টা ৭ ঘন্টা নয়, সমঘন্টা ঘুম দরকার অর্থাৎ ৪ ঘন্টা ৬ ঘন্টা ৮ ঘন্টা। রাত ১০ টার মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে — সম্ভব হলে ভোর ৪ টেয় উঠতে হবে।

ব্যায়াম : প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণ ৩০ মিনিট ও তার সঙ্গে হালকা ব্যায়াম দরকার। সম্ভব হলে, সন্ধ্যাবেলায়ও ৩০ মিনিট হাঁটতে হবে।

ঔষধ : শরীরে যে কোনও অসুস্থতা থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিতে হবে। সম্ভব হলে বৎসরে একবার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা খুবই প্রয়োজন।

এতো গেল শারীরিক দিক। এরপর আত্মিক ভোজনের সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলা দরকার। আমরা দেহ সর্বস্ব মানুষ শরীর ও আত্মাকে এক মনে করি। শরীরকে সুন্দর বানানোর চেষ্টা করি। শরীর বিনাশী কিন্তু আত্মা অবিনাশী। বিনাশী শরীরের কথা চিন্তা করে তাকে ফল, মূল, ঔষধ, নানাপ্রকার খাবার খাইয়ে তার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি, কিন্তু যে আত্মা শরীরের এনার্জী, যে আত্মা শরীররূপী গাড়ীর ড্রাইভার অর্থাৎ যে আত্মা শরীর চালায় তারও শক্তি বৃদ্ধির কথা আমাদের মনে কখনওই আসে না। আত্মাই মূল — শরীর আত্মার বস্ত্র। আত্মা শরীর প্রাপ্ত হয় এজন্য যাতে সে শ্রেষ্ঠ চিন্তন, সুকর্ম করে, নিজের সেবা (স্বসেবা) ও বিশ্বের সেবা করতে পারে।

শরীরের উন্নতি সাধারণ চর্মচক্ষু দ্বারা দেখতে পাই, কিন্তু আত্মার উন্নতি দেখতে গেলে কোনও চক্ষু বা তৃতীয় নেত্রর দরকার। কান, চক্ষুর উন্মোচনের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত কান প্রয়োজন। এজন্য ঈর্ষা, পরনিন্দা, পরচর্চা, ক্ষোভ, মোহ, কাম, ক্রোধরূপী ভোজন আত্মাকে অপবিত্র করে। আত্মার জন্য শুভ ভাবনা, পবিত্রতা প্রয়োজন। আত্মার সবশেষে প্রিয় ভোজন ঈশ্বর চিন্তন ও প্রার্থনা। তাই প্রতিদিন 'রাজযোগ' বা মেডিটেসন বা ধ্যানের অভ্যাস প্রয়োজন।

রাজযোগের দ্বারা আত্মা ৭টি শক্তি লাভ করে। ৩৬টি দিব্যগুণ অর্জন করে। এই ৭টি শক্তি হল — জ্ঞান, গুণ, শান্তি, শক্তি, আনন্দ, প্রেম ও পবিত্রতা। এই রাজযোগ হল আত্মার প্রধান ভোজন। রাজযোগের মধ্য দিয়ে জীবনে আসে সন্তুষ্টি। এই সন্তুষ্টি আনে জীবনে আনন্দ। আসে পবিত্রতা, ভালো মন্দ-বিচার করার ক্ষমতা। ইতিবাচক ভাবনা আনতে কোনও অসুবিধা হয় না। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অভীষ্ট বস্তু লাভ করতে না পারলেও জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ সব পরিস্থিতিতে সমান থাকা যায়। তাই শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন সুষম (Balanced) আহার প্রয়োজন, তেমনি মানসিক সুস্থতার জন্য আত্মিক ভোজন দরকার।

বোধকথা

আত্মবিশ্বাস

জীবনে কিছু করার চিন্তাটা তার এসেছিল কলেজ জীবন থেকেই। পোরাস ইরানির বাড়ির অবস্থা খারাপ ছিল না। ইরানীর এমন অবস্থা ছিল না যে, কাজ না করলে পেটে ভাত জুটবে না। তবুও 'বাবার হোটেলে' বসে বসে খাওয়াটা বরাবরই রুচিতে বেধেছে ইরানির। বাবার বড় ব্যবসা। নাম-খ্যাতি যথেষ্ট। ইরানি চেয়েছেন বাবাকে তার কাজে সহযোগিতা করতে। সঙ্গে নিজেকে কোনও একটা কাজে ডুবিয়ে রাখতে। দিনের কলেজে ভর্তি হলে সে আশা পূর্ণ হবে না বলেই, নৈশ কলেজে লেখাপড়া শুরু হল তার। লক্ষ্য যাতে বাবাকে কাজে হেল্প করা যায়। সঙ্গে নিজের স্বপ্ন পূরণ। ইরানি ভাবলেন শুধু রোজগার নয়। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে উপার্জন ও জনসেবা দুই-ই হয়। সে চিন্তা থেকেই ইরানি শুরু করলেন সাফাই-অভিযান। একদিকে রোজগার। অন্যদিকে স্বচ্ছতা। ইরানির উপার্জনের সহজপাঠের হাতেখড়ি হল স্বচ্ছতা বিভাগ থেকেই। ব্যাঙ্গালোর নগরীকে স্বচ্ছ রাখার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। তবে রাস্তা বা শহর নয়। তার দায়িত্ব অনেক বড়। লোকের ঘর-দুয়ার স্বচ্ছ রাখার কাজ শুরু করলেন তিনি। নিজে না হলেও, উপযুক্ত কর্মীকে বাছার গুরু দায়িত্বটা তিনি নিজেই সামলেছেন। এক বড় কোম্পানীর গ্রিল পরিস্কারের কাজের কন্ট্রাক্ট প্রথম হাতে আসে তার। নিজের তৈরি টিম যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে। এই কাজে টাকা কম এলেও, কাজে শপিংমল থেকে উৎসব মহল স্বচ্ছ রাখার দায়ভার সামলেছেন তিনি। পার্টির আনন্দ-বিনোদনের পরিবেশকে পরবর্তী পার্টির জন্য, আবার নতুন করে সাজিয়েছেন।

বাড়ি-ঘর সাফ করার কাজেও বড় হওয়া যায়। ইরানি এর আগে স্বপ্নেও ভাবেননি।

ফাঁকি দেননি ইরানি, তবে এর পর থেকে পিছনে তাকাতে হয়নি তাকে। একটার পর একটা কাজের বরাত পেয়েছেন। একদিকে লেখাপড়া, অন্যদিকে ব্যবসা — দুই মেরুতেই সমান দক্ষ তিনি। নিজের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল, তাকে কাজে লাগিয়েছেন। ইতিবাচক চিন্তার ফল হাতে হাতে পেয়েছেন ইরানি। শুধুমাত্র কমপ্লেক্স নয়, বড় বড় আজ ব্যাঙ্গালোরের অনেক গৃহকর্তা পরিচারিকার জন্য তার দ্বারস্থ হয়। যাতে উপযুক্ত কাজের লোক পাওয়া যায়। ইরানির পরিশ্রমে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান কোনও নাম-গোত্রহীন নয়। হ্যান্ডিম্যান সার্ভিসেস লিমিটেডের নাম দেশজুড়ে প্রচলিত। ব্যাঙ্গালোর শহরের বড় প্রতিষ্ঠান।

ইরানির এই ঘটনা কোনও গল্প নয় —বাস্তব।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার যিশুখৃস্টের জন্ম-তারিখ হিসেব করে খৃস্টাব্দ-পঞ্জি তৈরি করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে গবেষণা করে দেখা যায়, সিজারের হিসেবে চার বছর আগেই যিশুর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে 'খৃস্টাব্দ ক্যালেন্ডার'-এর প্রচলন এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, সে ভুল আর সংশোধন করে নেবার উপায় ছিল না। স্বভাবতই ওই চার বছরের ভুল আজও বয়ে বেড়াচ্ছে সারা পৃথিবী।

✠ ✠ ✠

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১৯৬০ সালে বিখ্যাত 'স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য পান ৩০ হাজার ডলার। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে তিনি ১৫ ডলার করে পান। লেখার বিষয়বস্তু ছিল স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই। একটি প্রবন্ধের প্রতিটি শব্দ গুণে এত পারিশ্রমিক আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও লেখকের ভাগ্যে জোটেনি।

✠ ✠ ✠

চেন্নাইয়ের তিন বছরের মেয়ে তামান্না নিজের দেহাংশ দিয়ে তিনজন মৃতপ্রায়কে জীবন দান করে এক অদ্ভুত নজির গড়ল। এ বছর ২০ জানুয়ারি এক ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় তামান্নার মায়ের মৃত্যু হয়। বাবা গুরুতর জখম। তামান্নার মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটে। বাবার ইচ্ছেয় মেয়ের হৃৎপিণ্ডটি এনে প্রতিস্থাপন করা হয় বেঙ্গালুরুর ২১ মাসের শিশুর দেহে। যকৃৎ বসানো হয় আড়াই বছরের অন্য এক শিশুর দেহে। কিডনি দু'টি পান ৬০ বছরের এক প্রবীণ।

✠ ✠ ✠

লেখকদের অদ্ভুত সব খেয়াল আর সংস্কার! বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকবার লেখার পর কলমটি ধুয়ে মুছে রাখতেন। ফরাসি লেখক ভিক্টর হুগো না-দাঁড়িয়ে লিখতে পারতেন না। 'লা মিজারেবল' উপন্যাসের পুরোটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখা।

✠ ✠ ✠

ফোর্ড থিয়েটারে নাটক দেখার সময় খুব কাছ থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহম লিঙ্কনকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন অভিনেতা জন উইলকিস বুথ। ঘড়িতে তখন রাত দশটা দশ। লিঙ্কনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পৃথিবীর সময় থমকে গিয়েছে বোঝাতে বিশ্বের সর্বত্র ঘড়ির বিজ্ঞাপনে সময় দেখানো হয় দশটা দশ।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৩

রঙ্গকৌতুক

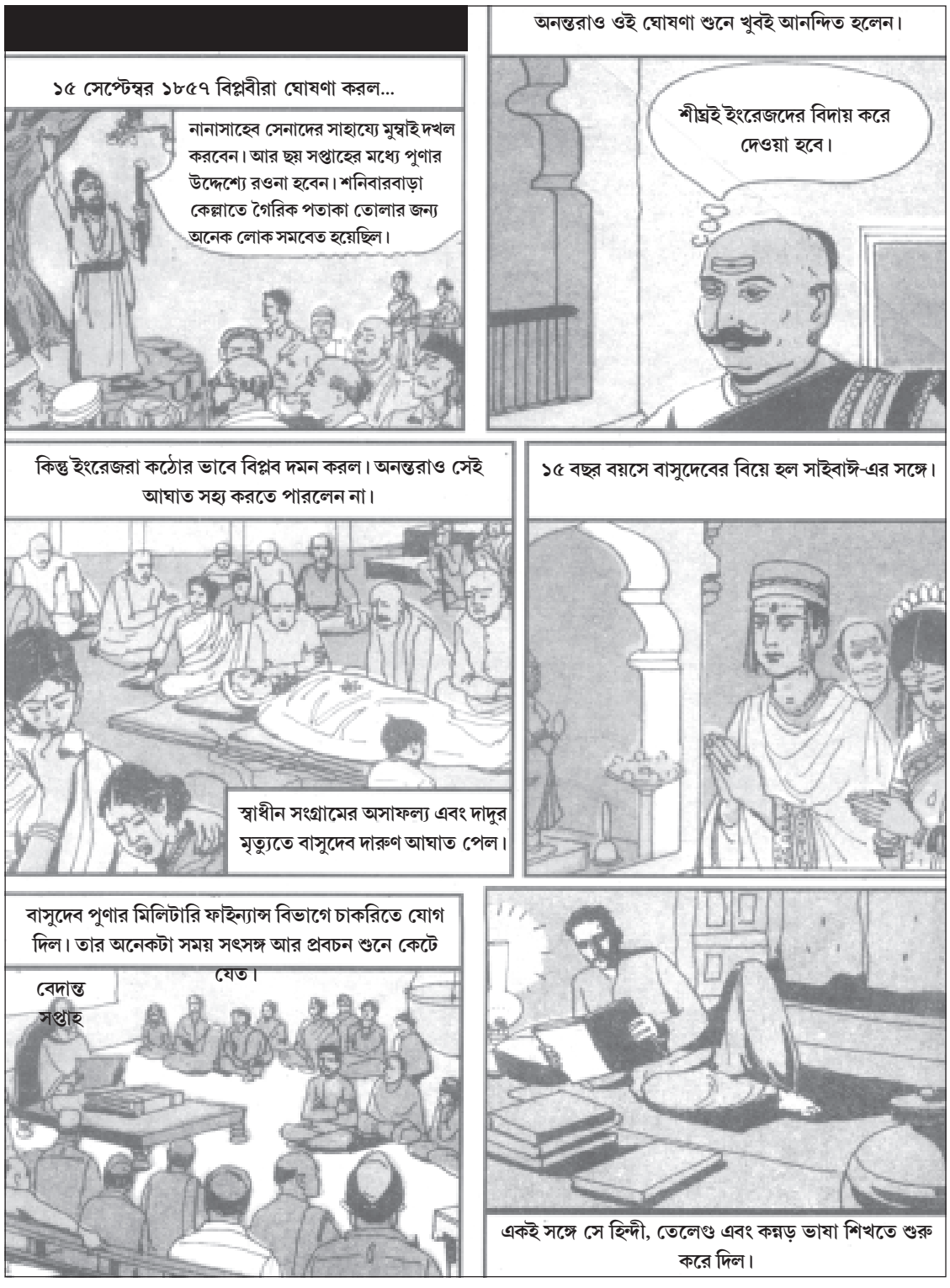

☺ গৃহস্থ ঃ চুরি করতে লজ্জা করে না!

চোর ঃ - করে তো। সেজন্যই তো রাতের অন্ধকারে চুরি করতে বেরিয়েছি।

★ ★ ★

☺ — জানিস, কাল যখন ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছি, তখন দেখি আমার হাতঘড়িটা নীচে পড়ে গেল। অবশ্য মাটিতে পড়ার আগেই আমি নীচে নেমে ঘড়িটা ধরে ফেলেছি।

— মিথ্যে কথা বলার জায়গা পেলি না।

— মাইরি বলছি, আমার ঘড়িটা পাঁচ মিনিট স্লো ছিল ত!

★ ★ ★

☺ সাংবাদিক ঃ এবার ভোটে আপনার হারের কারণ কী, স্যার।

নেতা ঃ ভোট গণনা ঠিকভাবে হয়েছে কি না!

★ ★ ★

☺ — এ খাবার তো কুকুরেও খায় না হে!

— ডগ-বিস্কুট এনে দেব স্যার?

★ ★ ★

☺ টিকিট কাউন্টার ঃ এ কী, আপনি বারবার একই শো'র টিকিট কাটছেন কেন?

দর্শক ঃ কী করব, সিনেমা হলের গেট-এ ঢুকতে গেলেই একটা লোক টিকিটটা ছিঁড়ে দিচ্ছে যে!

★ ★ ★

☺ লাল্টি ঃ সব টাকার নোটে গান্ধীজি হাসেন কেন বল্ তো?

বাল্টি ঃ আরে, কাঁদলে নোট ভিজে যাবে না!

★ ★ ★

☺ শিক্ষক ঃ বল্ দেখি, চাঁদ দূরে না দিল্লী?

ছাত্র ঃ দিল্লী। আকাশে তাকালেই তো রাতে চাঁদ দেখা যায়। — নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। নিউইয়র্কে একটি চতুষ্পদ প্রাণীর নামে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। নাম কী?

২। 'নেংটি দত্ত' চরিত্রটি কোথায় আছে?

৩। অলিম্পিক গেমসের যে-পাঁচটি বলয় বা রিং আছে তা কোন্ পাঁচটি মহাদেশকে বোঝায়?

৪। রাজা দশরথের আদেশে চৌদ্দ বছর বনবাসকালে লক্ষ্মণকে সীতার কিছু সামগ্রী বয়ে বেড়াতে হয়েছে। কী সেই সামগ্রী?

৫। গ্রীকদেশের লোকেরা খেলাটাকে বলত এপিস্কার্ডস, রোমানরা বলত হারপেস্টাম্ আর চীনারা বলত সুচু। কী খেলার কথা বলা হচ্ছে? — গলফ / নৌবাইচ / ফুটবল

৬। ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল আরও একটি অতি জনপ্রিয় জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। কী সেটা?

— নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। বাফ্যালো ইউনিভার্সিটি।
২। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মগ্নমৈনাক' উপন্যাসে।
৩। আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও ওসিয়ানিয়া (অস্ট্রেলিয়া)।
৪। জামাকাপড় ভর্তি অতিকায় একটি চর্মপেটিকা।
৫। ফুটবল।
৬। প্লাইউড।

সরসঙ্ঘচালক হিসেবে কলকাতায় প্রথম এলেন মোহনরাও ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক হিসাবে এই প্রথম কলকাতায় এলেন মোহনরাও ভাগবত। গত ৬ মে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে তিনি কলকাতায় আসেন এবং লেকটাউন প্রভাত শাখায় যান। সেখানে স্বয়ংসেবকদের সামনে তিনি বলেন, সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের প্রতিরূপ। হিন্দু জাতিকে পরম বৈভবশালী করাই সঙ্ঘের লক্ষ্য। আর এজন্য চাই সঙ্ঘের প্রতীক। আমরা স্বয়ংসেবকরা অন্য হিন্দুদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ— এই ভাবনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমাজে আমাদের তুলনায় উন্নত গুণের অনেক হিন্দু রয়েছেন। অহঙ্কার ও কর্মজড়তা ছেড়ে সঙ্ঘের কাজ করলেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক হবে। তখন এই দেহে এই চোখেই তা দেখতে পাবো। একবার হতাশার পরিবেশে এই প্রদেশের এক বৈঠকে বলেছিলাম, হিম্মতের সঙ্গে কাজ করে যেতে

লেকটাউন শাখায় সরসঙ্ঘচালক মোহনজী (বাঁ দিক থেকে), অতুল বিশ্বাস ও রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। —ছবি ঃ বাসুদেব পাল

'অব্যাভিচারী বিশ্বাস ও তদনুরূপ সাধনা'। সঙ্ঘের কাজের মাধ্যমেই আমাদের দেশ পরম বৈভবশালী হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

গত ৮৩ বছর ধরে সঙ্ঘ সাধনা করে চলেছে। সাধনা যাতে রুটিন না হয় এজন্য স্পিরিট বা তীব্র ইচ্ছা চাই। শাখার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দক্ষ-আরম-এর মাধ্যমে দেহ-মন-বুদ্ধি র বিকাশ ঘটাতে হবে। পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন নয়। প্রয়োজনে হাফ প্যান্টেরও পরিবর্তন হতে পারে, কেননা হাফপ্যান্ট সঙ্ঘের প্রতীক নয়। স্বয়ংসেবকদের আচরণই হবে। তাহলেই আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আর এজন্য মাত্র আরও তিরিশ বছর বাঁচার কষ্ট স্বীকার করতে হবে। এটা কোনও ভবিষ্যতবাণী নয়। পরিস্থিতি ও দেশ বিদেশের পরিভ্রমণের অনুভবের কারণেই একথা বলেছি।

এটা আমরা প্রত্যক্ষও করতে পারবো। সঙ্ঘের কাজ ভগবানের কৃপাতেই হবে। কিন্তু এজন্য যোগ্য হতে হবে। নিরংহকারী, চৈতন্যবান ও কৃতিবান হওয়ার জন্য সাধনা করতেহবে।

উত্তর কাছাড় জেলায় সঙ্ঘের নতুন কার্যালয়

গত ২৭ মার্চ বর্ষ প্রতিপদের পুণ্য তিথিতে উত্তর কাছাড় জেলার উমরাংশু নগরে সঙ্ঘের নতুন কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন সম্পন্ন হল। কার্যালয়ের জন্য ২৩৫০ দালানঘর দান করেন অসম ক্ষেত্রের উত্তর কাছাড় জেলার হাফলং নিবাসী হিরন্ময় বাতোরি। তাঁর দুই সন্তান সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অসম ক্ষেত্র কার্যবাহ মাণিক চন্দ্র দাস। এছাড়া অনান্যদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ অসম প্রান্ত গ্রামবিকাশ প্রমুখ রাজেশ্বর সিংহ, উত্তর কাছাড় জেলা প্রচারক দীনেশ তেওয়ারী সহ সঙ্ঘের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উপলক্ষে গায়ত্রী যজ্ঞানুষ্ঠান, নাম-সংকীর্তনসহ একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শোক সংবাদ

মালদা জেলার গোপালগঞ্জ খণ্ড কার্যবাহ তরুণ মণ্ডলের পিতা রূপলাল মণ্ডল গত ৯ এপ্রিল দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

★★★

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বিদ্যার্থী পরিষদের সক্রিয় সদস্য বাপ্পাদিত্য মণ্ডলের পিতৃদেব বিপদভঞ্জন মণ্ডল গত ১৫ এপ্রিল অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে গেছেন।

★★★

চলে গেলেন প্রখ্যাত বাগ্মী, ঐতিহাসিক তথা ব্যাকরণবিদ আচার্য রামনাথ সুমন। গাজিয়াবাদের ধোলিয়ানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। হিন্দু সংস্কৃতির আজীবন সাধকের মৃত্যুতে শোকাহত সমগ্র হিন্দু সমাজ। তিনি ভারত সংস্কৃতি পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতিও ছিলেন।

নতুন দিল্লীর রামকৃষ্ণপুরমের সঙ্কটমোচন মন্দিরের এক স্মরণসভায় তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সাধু-সন্তগণ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি অশোক সিংঘল আচার্যের মৃত্যুতে গভীরশোক প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতিতে একটি স্মরণিকা প্রকাশের কথা বলেন।

পরলোকে মদন আঢ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার পুরশুড়া শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মদন আঢ্য গত ২ মে শনিবার, পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বৎসর। স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুদের তিনি রেখে গিয়েছেন।

তিনি কলকাতা মানিকতলা শাখার মূল স্বয়ংসেবক। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি বহুবার সঙ্ঘের বিভিন্ন শিবিরে ভোজন বিভাগের দায়িত্ব সামলেছেন। পুরশুড়ায় তাঁর বাড়ি স্বয়ংসেবকদের কাছে অবারিত দ্বার ছিল। বেশ কয়েক বছর তিনি আরামবাগ মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরই প্রয়াসে সঙ্ঘের তৎকালীন প্রচারক প্রমুখ স্বর্গীয় উমাকান্ত আপ্তেজীর উপস্থিতিতে পুরশুড়া শাখা শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল সঙ্ঘ অধিকারীই পুরশুড়া শাখায় গিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ একজন আদর্শনিষ্ঠ স্বয়ংসেবককে হারাল।

ভোটদাতার কড়চা

(৯ পাতার পর)

বলে তৃণমূল দাবি করতে পারে? তৃণমূলের এই ক্ষতির জন্য বিজেপি কেন দায়ী হতে যাবে?

বিজেপি সমর্থক যখন বলছিল, তখন সকলেই মনোযোগ দিয়ে তা শুনছিল এবং মাথা নেড়ে সায়ও দিচ্ছিল। কিন্তু যুক্তিতে হেরে গেলেও মধ্যবিত্ত কখনও হার মানে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পরিত্রাণ পেতে চায়। এক্ষেত্রেও সিপিএম ও তৃণমূল একযোগে প্রসঙ্গ তুলেছে গোর্খা ও কামতাপুরীদের। উভয়েই বিজেপি-র বিরুদ্ধে বাংলাভাগের অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে। দিদি তো ১লা মে রাখী বন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন।

বিজেপি সমর্থক যুবকটি শান্তভাবে এই বাংলা ভাগের অভিযোগের জবাব দিতে শুরু করল এইভাবে। স্বাধীনতার আগে মুসলমানরা আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিল। এই কমিউনিস্টরা কোনওদিনই ভারতকে এক জাতি একরাষ্ট্র বলে মেনে নেয়নি। তাদের মতে, হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি। তাই জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ন্যায়সঙ্গত। এই দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সেদিন কমিউনিস্টরা মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। কাশ্মীরীদের আলাদা হওয়ার দাবি তারা মেনে নিয়েছিল এই যুক্তিতেই। পাকিস্তানের দাবির মধ্যে এই পশ্চিমবঙ্গও সেদিন ছিল। শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে, এই পশ্চিমবঙ্গও আজ তালিবানদের ইসলাম রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়ে যেত।

মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকতে পারে। গোর্খা এবং কামতাপুরীদের থাকতে পারে না কেন? তাদের ভাবাবেগকে সম্মান জানিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেওয়ায় অন্যায় কোথায়? তৃণমূলের রাখী কি গোর্খা ও কামতাপুরীদের হাতে বাঁধা হবে? না কি রাজাবাজর, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজের মতো মুসলিম অধুষ্যিত অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষদের হাতে শুধু বাঁধা হবে?

এইসব প্রশ্নের সমাধান হয়নি। কারণ তার আগেই ট্রেন বি বা দী বাগে পৌঁছে গেছে। তাই মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী ভোটদাতাদের কড়চা এখানেই শেষ। ট্রেন কিংবা বাসে চলতে চলতে আবার যদি এরকম কড়চার খবর পাই অবশ্যই তা সকলকে জানাব।

ছড়া উৎসবের অঙ্গনে

দীপেন ভাদুড়ি

যুগ যুগ ধরে ছড়ার চর্চা হয়ে চলেছে। মা ঠাকুরমাদের কাছে শোনা ঘুমপাড়ানি গানের ছড়া দিয়ে শিশুর ছড়ার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। পরবর্তীকালে সেই শিশু সেসব ছড়া চর্চা করে। এবং ছড়া পাঠের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পথের পাঁচালী গ্রন্থে ইন্দির ঠাকুরণের মুখে ছড়া

শুনিয়েছেন, যেমন —

'ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন সে

রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে —

আবার — লাথি ঝাঁটা পায়ের তল

ভাত পাথরটা বুকের বল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। ছড়া যেমন —

আলো হয় দিঘি জল

গেল ভয়। ঝল মল।

চারিদিক যত কাক

ঝিকমিক দেয় ডাক।

আবার —

কাল ছিল ডাল খালি।

আজ ফুলে যায় ভরে।

বল্ দেখি তুই মালি,

হয় সে কেমন করে।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন - 'সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল, অল্প বয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাকরুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে।'

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন —

ভোর হল

দোর খোল

খুকুমণি ওঠোরে

ওই ডাকে

জুঁই শাখে

ফুল খুকি ছোটোরে

খুকমণি ওঠোরে।

ছড়ার কথা বলতে গেলে সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, লীলা মজুমদার, সুখলতা রাও ছাড়াও বাংলা ছড়ার জগতে অনেক ছড়াকার তাঁদের বলিষ্ঠ ছড়া উপহার দিয়েছেন।

অবশ্য এ সমস্ত মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কারের পরের কথা। মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কারের আগেও প্রচলিত ছিল ছড়া। ছড়ার মাধ্যমে গান গাওয়া হতো। এমনকী প্রাচীনকালে ছড়া কেটে কেটে খবরও পরিবেশন করা হতো। ছড়া ছিল

জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

ছড়ার প্রচলন যুগে যুগে ছিল। বর্তমানেও আছে। এবং যাঁরা ছড়া নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের অভিমত আগামী দিনেও ছড়া চর্চা কমার কোনও লক্ষণ নেই। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সম্প্রতি ''নবম রাজ্য ছড়া উৎসব ২০০৯'' অনুষ্ঠিত হল দীঘায় ''আবোল-তাবোল'' মঞ্চে । আয়োজক অজগর। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল শিশু সাহিত্য সংসদ, পুনশ্চ, ছোটোদের কচিপাতা, এন ই পাবলিশার্স, সাহিত্যম, বিদ্যুৎ সহযোগিতায় ছিল পূর্বাঞ্চ ল সংস্কৃতি কেন্দ্র।

ছড়া উৎসব কমিটির সম্পাদক হান্নান আহসান এই প্রতিবেদককে জানালেন যে দুদিনের এই ছড়া উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক ছড়াকার অংশগ্রহণ করেন এবং ছড়াপাঠ করেন। মতিলাল কিসকু (সচিব, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পঃ বঙ্গ সরকার) সাঁওতালী ভাষায় ছড়া পড়ে শোনান এবং সেই ছড়াটি বাংলায় অনুবাদ করে ''ঘুঘু' নামক ছড়া পড়েন। সম্পাদক আরও জানালেন প্রথম রাজ্য ছড়া উৎসব শুরু হয়েছিল এই দীঘায়। গত বছর হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে যদুভট্ট মঞ্চে । পরিশেষে জানাই এই প্রতিবেদকও কয়েকটি ছড়া পাঠ করেন।

গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনুন

(৩ পাতার পর)

ধর্ষিতা ও নিহত হলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (ড.) জ্যোতি বসু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, 'এই রকম কতই তো হয়।' (তাঁর পরিবারের কারও এই রকম হলে তিনি কী বলতেন, জানি না)। ছোট আঙারিয়ার সারমেয় চরিত্রের পুলিশ খারাপ কিছু পায়নি, কিন্তু সিবিআই গণহত্যার প্রমাণ পেয়েছে। তবে ভয়ে-আতঙ্কে সঙ্গীরা আদালতে সব কথা বলতে পারছেন না। তাপসীর ব্যাপারে 'ন্যাতারা' ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী ফেঁদেছিল, পুলিশ যথারীতি হুক্কাহুয়া বর তুলেছিল সেই সুরেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও সিবিআই পেয়েছে ধর্ষণ ও হত্যার প্রমাণ। তারা অপরাধীকে ধরে, দলদাস পুলিশ ঠিকমতো চার্জসিট দেয় না। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেখা গিয়েছিল ৭০ হাজার জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট থানায় থানায় পড়ে অছে। এই রকম ওয়ারেন্ট নিয়ে জনা দুই মন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিং আলো করে রয়েছিলেন দীর্ঘদিন।

বিজনসেতুতে ১৭ জন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীনীকে পিটিয়ে-পুড়িয়ে-থেতলে মারা হয়েছিল। কারণ তাঁরা গঠনমূলক কাজ করছিলেন, তাতে শাসক দলের সাংগঠনিক ক্ষতি হচ্ছিল। আর মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ডেকে এনেছিলেন বাম নেতারা, কিন্তু ক্ষমতায় বসে তাঁরাই তাদের পিটিয়ে পুড়িয়ে তাড়িয়েছেন। টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। যাতে তাঁরা জল আনতে এলে ধরা যায়। সেই কলগুলোতে বিষ ঢেলে শ'খানেক শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। কিছু মানুষকে ব্যাঘ্র প্রকল্পে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছিল বাঘের খাদ্য হিসেবে। অনেককে লঞ্চে করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। হিসেবটা দেখুন গৃহদাহ ১০০০, ছিনতাই ২৭৭৮ টাকা, অনাহারে শিশুমৃত্যু ৯৪, আত্মহত্যা (অনাহারে) ২, আহত-১৫৪, নিখোঁজ ১২৮, আটক ৫০০, ধর্ষিতা, ২৪, গুলিতে মৃত ২৮০ (তুষার ভট্টাচার্য, দৈনিক স্টেটসম্যান, ১২.৪.০৯)। সেই লঞ্চে র মাঝি নিখোঁজ। যে অফিসারের নেতৃত্বে এসব হয়েছে, তিনি দিনের আলোয় নিহত হয়েছেন তপসিয়ায় (সাক্ষী রাখতে নেই, তাই?)

এমনটা তো স্বৈরতন্ত্রে হয়?

আমরা বৃটিশ ধাঁচের গণতন্ত্র গ্রহণ করেছি। সেখানে শাসক দল বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করে নীতি নির্ধারণ করে, বিল তৈরি করে। স্যার জেনিংস লিখেছেন, সেইজন্য সংসদে বহু বিলের সমালোচনা হয় না-- 'Many bills are not opposed because there is general agreement'-(দ্য কুইন'স্ গভর্নমেন্ট)। আর ল্যাস্কি লিখেছেন, সমর্থকদের স্তাবকতা থেকে নয়----বিরোধীদের সমালোচনা থেকেই সরকার পথ খুঁজে নিতে পারে। এই সব কারণে সেখানে গণতন্ত্র সফল হয়েছে। সঙ্কট সরিয়ে সব দল মিলে সম্মিলিত সরকার গঠন করে--দুই মহাযুদ্ধে র সময় সেটাই হয়েছে। আর্থিক মন্দার সময়ও (১৯৩১) গড়ে উঠেছিল 'ন্যাশনাল গর্ভনমেন্ট।'

আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সদম্ভে বলেন--'আমাদের ২৩৫, ওদের ৩০----ওদের কথা শুনব কেন?' কখনও বীরদর্পে বলেন---'ওদের মাথা ভেঙে দেব।' ফলে পুলিশ সন্ত্রাস, বারবার জারি হয় ১৪৪ ধারা।

গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই ঘাতকদের এবারের নির্বাচনে একটা দিন-পরে, বিধানসভার মাধ্যমে একেবারে বিদেয় করে দিতে পারবেন?

শব্দরূপ - ৫০৭

অয়ন পাল

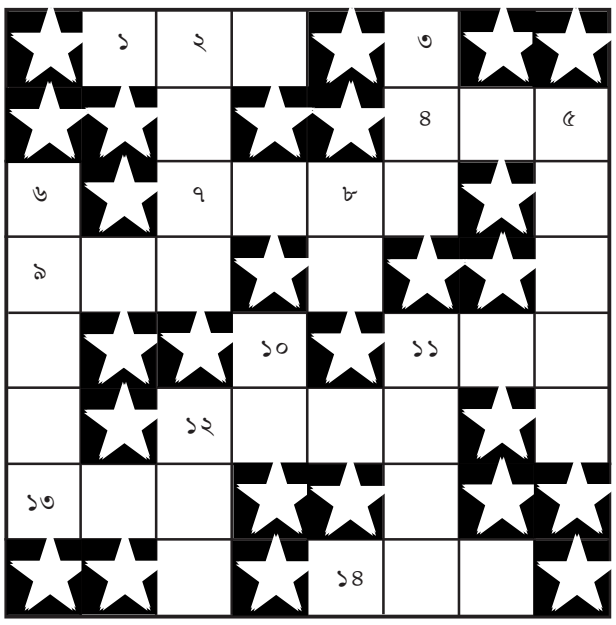

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু, ৪. প্রতি শব্দে গানের তাল, একে-তিনে কাগজের পরিমাণবিশেষ, ৭. রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ৯. ধোপা, রং কারক, ১১. ফুলের রেণু, ১২. শুদ্ধ শব্দ বিবাহ, প্রথম দুয়ে ডানাযুক্ত উপদেবীবিশেষ, ১৩. মিষ্টি প্রস্তুতকারক, মোদকজাতি, ১৪. গানের দ্বিতীয় তুক, গানের স্থায়ী মাঝের অংশ।

উপর-নীচ ঃ ২. বিশেষণে দানব বা অসুরের মতো, মধ্যে ঈশ্বরের দূত, ৩. তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার — চাই, ৫. পৃথিবীর জলভাগের প্রধান বিভাগ, বৃহৎ সমুদ্র, ৬. ইনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, প্রথম দুয়ে অনাত্মীয়, শেষ দুয়ে রঘুবর, ৮. শিশু রক্ষাকারিণী দেবীবিশেষ, ১০. যীশু মাতা, ১১. বিশেষণে সুলক্ষণযুক্ত, ভাগ্যবান, ১২. বড়ো থালাবিশেষ।

সমাধান শব্দরূপ ৫০৫

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

পা	■	স	ক	ল	■	খো	■
ন্ড	■	র	■	ক	লা	দ	■
ব	ৎ	স	■	ড়ি	■	কা	■
স	■	■	■	■	প	র	শু
খা	গ	ড়া	■	■	■	■	ম্ভ
■	ণ	■	ম	■	সু	ষ	নি
■	প	ব	ন	■	ম	■	শু
■	তি	■	সা	ধ	না	■	ম্ভ

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ মে ২০০৯ সংখ্যায়।

নীতি নৈতিকতার ব্যভিচারীদের মানুষ চিনে ফেলেছে

বিশাখা বিশ্বাস

কভী হমসে কভী গৈরোঁসে শনাসয়ী হ্যয় / বাত্ কহনে কী নহীঁ তু ভী তো হরজাঈ হ্যয় ! / কখনো এর, কখনো ওর সাথে তোমার লীলা — কী আর বলবো, তুমি তো বহুজন রংগিলা !

— ইকবাল।

কোয়েম্বাটুরের বোমা বিস্ফোরণের নায়ক, জেল খাটা কয়েদী, নিজেকে 'ভারতের লাদেন' বলে পরিচিতি পেয়ে যার আত্মতৃপ্তি — সেই মৌলানা আব্দুল নাসের মাদানী আর তার সাগরেদদের জন্যে তোমরা পেতে রেখেছো নিশিযাপনের নরম শয্যা। রাজীব গান্ধীর সাথে সম্পর্কের অজুহাতে আর অপবাদে তোমরা যারা একদিন কমরেড সৈফুদ্দিন চৌধুরীকে দলছাড়া করেছিলে — সেই রাজীব গান্ধীরই বিধবা পত্নীর পদসেবার অধিকার চেয়ে সেই তোমরাই দিয়েছিলে (এবং এখানো দিচ্ছ) নীলামের সর্বোচ্চ ডাক। রাজ্যের ঘন্টা চ্যানেলের বুকখোলা বিজ্ঞাপনীয় যুবক-যুবতীর মৈথুনের ক্ষণকালীন আলাপচারিতার মতো আদর্শের বিভাদীপ্ত বাতি হাতে নিয়ে তাজ করিডোর-কেলেঙ্কারীর নায়িকা জাত-পাতের মায়াবন বিহারিণী কুমারী মায়াবতীর পথ চেয়ে তোমরা গান ধরেছো, 'তুমি যে বলেছিলে এ পথে আসিবে .... সে কী আজ ভুলে গেলে'। নীতি-নৈতিকতার রোদ ও জলের অনুসন্ধান নিয়ে জীবনের অন্বেষণে তোমরা খুঁজে পেয়েছো সেই দক্ষিণী নায়িকাকে — জীবন যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সেই আপ্তবাক্যের ঃ ফ্রেলটি, দাই নেম ইজ উয়োম্যান।

'চড়া-কড়া হিন্দুত্বের জায়গায় আলো-আঁধারি নরম হিন্দুত্বের পথে চলে যে কংগ্রেস' (গণশক্তি ১৫-৩-০৯), সেই কংগ্রেসকেই ভোটের পরে দেহদানের বাক্‌দান করে রাখো তোমরা (বুদ্ধের বিবৃতি ১৪-৪-৯০)। তোমরা অটল-আদবানীদের হাতে রেখেছিলে হাত, সাম্প্রদায়িকতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে সাম্প্রদায়িকতার অন্য পীঠের যে তোষণবাদ, সেই তোষণবাদের সাথে বিচ্ছিন্নবাদকে জল-সারে পুষ্ট করে তোমরা ঘিসিংয়ের হয়েছো বান্ধব, কুখ্যাত সেই টি আর এস-এর হয়েছো জোটসঙ্গী, চীনা অনুপ্রবেশকারী উত্তরবঙ্গের মঠাশ্রিতদের হয়েছো দার্শনিক মিত্র, গরীব পার্ট্রি গরীব প্রেমের ইউটোপিয়াটি বত্রিশ বছর ধরে ভেঙে চুরচুর করে সুগন্ধী পানমসলার প্যাকেটে পুরে তোমরা পাঠিয়েছো টাটার বাড়ি — বহু বছর বাদে ভাণহীন স্বচ্ছ সহজতায় তোমরা করেছো উচ্চারণ, পুঁজিবাদের পথই উন্নততর মার্ক্সবাদের অমৃতপথ, আল্লার কী কুদরৎ !...

এরই নাম আত্মহীনতার রহস্য কথা। আত্মদম্ভী ভন্ডদের আত্মদর্শনহীনতার এই রসকথাকেই মহাকবি ইকবাল বলেছিলেন, 'রুমুজ-এ-বেখুদি'। এই চরিত্রহীন নীতিবাগীশদের লক্ষ্য করেই অটলবিহারী বাজপেয়ী কি বলেছিলেন, অন্ধেরা ছুটেগা নঁহী, সুরজ উগেগা নঁহী, মানুষ ভুলেগা নঁহী (অটলজীর কাছে মার্জনা চেয়ে) !

অতএব, মরা 'থার্ড ফ্রন্টের' শবের ওপরে ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠা 'তৃতীয় বিকল্পের' সেকুলার ও স্বাধীন বিদেশনীতির সতীরানীরা আবার জোট বাঁধছেন, বহুজনের ঘরকরা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের নিয়ে আবারও আলকাপের আসরে নেমেছেন। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রভাবযুক্ত 'স্বাধীন বিদেশনীতি'-র টগর বোষ্টমীরা একদিন কংগ্রেসী নাগরদের "আমাদের খদ্দের' (শুদ্ধ ভাষায় 'আমাদের লোক') বলে সাজিয়ে দিয়ে সমর্থন করতো সেই উপা-সরকার ০৬-০৭ সালে দেশের চাষীকে কিলো প্রতি সাড়ে আট টাকা গমের দাম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে দশ লক্ষ টন গম আমদানী করেছিল — কিলো প্রতি চৌদ্দ টাকা বিরাশি পয়সা দরে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলে বরুণ গান্ধী জেলে হাজতের ঠান্ডা মেঝেতে রাত্রি কাটান, সাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরে থাকা সেকুলার সতী মার্ক্সবাদীদের রাতের বিছানায় এখন অনেক খদ্দের ঃ কেউ নবীন, কেউ দেবেগৌড়া, কেউ চন্দ্রবাবু, কেউ এ আই ডিএমকে, কেউ বহুজন সমাজবাদী পার্টি। এই নীতিবাগীশ টগর বোষ্টমীদের সামনে আদর্শ একটাই ঃ যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, কড়ি ফেলবে যে;এ দেহ লুটুক সে। লক্ষ্যও একটাই : দুটি আসন অর্জন। তাই বাংলায় বুদ্ধ গান ধরেছেন : তোমার চরণকমলে অপরাধী শ্যাম, ক্ষমা কর রাণী (অস্যার্থ - কংগ্রেসের সাথে আবার ঘর করা চলতেই পারে)। তাই দিল্লীর করাত আবার সুর ভাঁজেন : যাইবি পশ্চি মে, বলিবি পূবেতে / মনের কথাটি রাখিবে মনেতে / তবে তো পিরিতি জমিবে ভালো ... (অর্থাৎ, ভোটের পরে হবার যা তা হবে, এখন চেপে যা, স্রেফ চেপে যা)। দেওয়ালের কান আছে।...

> **"এই নীতিবাগীশ টগর বোষ্টমীদের সামনে আদর্শ একটাই ঃ যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, কড়ি ফেলবে যে এ দেহ লুটুক সে। লক্ষ্যও একটাই হ্ল দুটি আসন অর্জন। তাই বাংলায় বুদ্ধ গান ধরেছেন হ্ল তোমার চরণকমলে অপরাধী শ্যাম, ক্ষমা কর রাণী।"**

জয় অনিশ্চি ত তবু ভয় নাই। চোখে জল আর জঠরে আগুন নিয়েও মানুষ ফসলের ক্ষেত্রে এবার জীবনের প্রতিধবনি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঁচার প্রেরণা মন থেকে কেড়ে নিতে চায় যে চতুর শেয়ালেরা, মানুষ এখন তাদেরই বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। দিকে দিকে রক্ত ও মৃত্যুর যে নদী বইয়ে দিয়েছো তোমরা — সেই রক্ত আর মৃত্যুর নদী সাঁতরে সাঁতরেই এখন এগিয়ে চলেছে মিছিলের মানুষ।...

খাও....খাও....তৃতীয় বিকল্পের মক্ষিকা রাণী, নীতি নৈতিকতার বাসরঘরে শেষ রাতের আধো ঘুম নেত্রে স্বপ্নে যখন মধু খাচ্ছো, তখন একটুকু বেশি করেই খাও।....

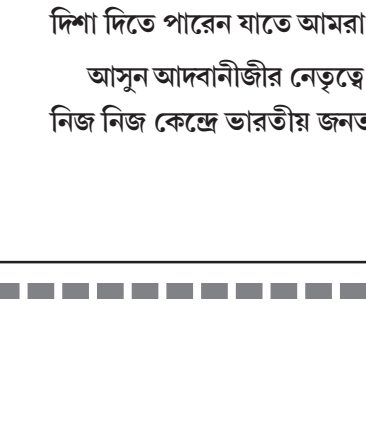

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর দেশবাসীর প্রতি আবেদন

"আসুন শ্রী আদবানীজীর নেতৃত্বে আগামী সরকার ও বৈভবশালী ভারত গড়ার দৃঢ় সঙ্কল্প নিই।"

আমার প্রিয় ভারতবাসীগণ,

পঞ্চ দশ লোকসভার জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করার নির্ণায়ক সময় এসে পৌঁছেছে। আজ ভারতকে চারদিক থেকে নানা প্রকার চ্যালেঞ্জ ঘিরে রেখেছে। এইসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য একজন (মজবুত) সুদক্ষ নেতা এবং নির্ণায়ক সরকারের আবশ্যক। এমন এক সরকার যে ভারতের জনগণের জন্য সুশাসনের মাধ্যমে, বিকাশ এবং সুরক্ষা সুনিশ্চি ত করতে পারবে। যে প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়েছে এবং যা শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানী সম্পূর্ণও করবেন।

আমি অসুস্থতার জন্য আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারছি না। কিন্তু আমি আপনাদের সকলের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কারণ বিগত দিনে আপনারা আমাকে এত স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন। কিন্তু আমার নিজের স্বাস্থ্যের চেয়েও বেশি চিন্তা আমাদের ভারতের স্বাস্থ্যের। এর উপাচার আপনাদের দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারাই হতে পারে।

আমি এবং শ্রী আদবানীজী ১৯৫২ সাল থেকে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে আসছি। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দৃঢ় সঙ্কল্পিত ব্যক্তিত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে এক দীপস্তম্ভ স্বরূপ। উনি চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে তাকে পরাস্ত করতে দক্ষ। উনি একজন সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট নায়ক যার সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধিগুলি সামনে আসা বাকি আছে। আমি মনেকরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর উপলব্ধিগুলি সামনে আসবে।

আমি আপনাদের সকলের কাছে বিশেষ করে আমার যুবক বন্ধুদের কাছে আবদন করছি যে আপনাদের সমর্থন, সহযোগ ও ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এন ডি এ-র সহযোগী দলগুলিকে দিন। কেবল আদবানীজীই ওই সকল স্বপ্নকে পূরণ করতে পারেন, যা আমরা একসঙ্গে দেখেছি। আদবানীজী দেশের শাসন ব্যবস্থাকে এক নতুন দিশা দিতে পারেন যাতে আমরা গরীবি, অনাহার-বেকারী-অসহায়তা আর অন্যায় থেকে মুক্ত এক ভারতবর্ষ তৈরি করতে পারি।

আসুন আদবানীজীর নেতৃত্বে আমরা আগামী সরকার গড়ার এবং বৈভবশালী ভারত নির্মাণ করার এক দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করি। এটা তখনই সম্ভ ব যখন আপনারা আপনাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি ও সহযোগী দলের প্রার্থীদের বিজয়ী করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

অটল বিহারী বাজপেয়ী

Swastika
11 May - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

সরকার যদি প্রতিশ্রুতি মতো নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেতন হতো তাহলে আজ কাজ হারিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগতে হতো না..

ভারতের উন্নয়ণের গতি আজ স্তব্ধ। কল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্মহীন হয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ যুবক । সাধারণ মানুষের উপার্জন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বিজেপির আর্থিক নীতি নিশ্চিতভাবে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে স্বরোজগার যোজনার দ্বার আরও বেশি করে উন্মুক্ত করবে। কেন না, আমরা শুধু কথার কথা বলি না, আমাদের কাজই আমাদের কথা।

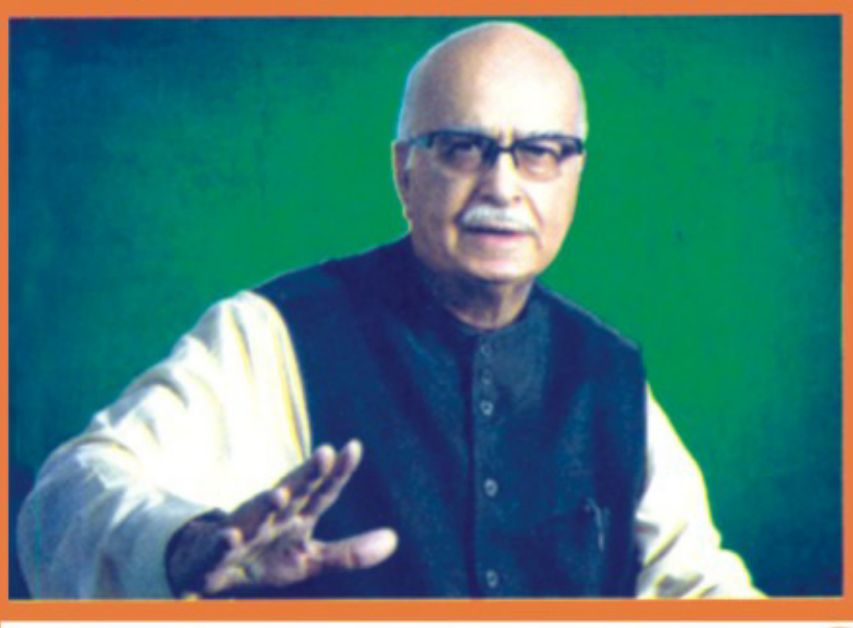

বি জে পি

Issued by BJP HQ, New Delhi

মজবুত নেতা, নির্ণায়ক সরকার

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com